উৎসর্গ

জীবনের সুখেদুঃখে
সুদিনে দুর্দিনে
তুমি ছিলে
স্বয়ংবৃত স্বচ্ছন্দ শরিক
হৃদয়ের নিভৃত দোসর।
আজ একা বিষণ্ণ সন্ধ্যায়
স্মৃতির শিখরে বসে
অতীতের অক্ষমালা জপি মনে মনে,
চেতনায় অবচেতনায়
তুমি আছ, স্বপ্ন সাক্ষী তার।

সূচিপত্র

একটি আলোর পাখি

প্রেমকে মৃত্যুকে

২৪ পৃষ্ঠায় 'মালিন্যকে অমিলন করার বৈন্য' হবে 'মালিন্যকে অমলিন করার বৈন্য'

১

আমার 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' প্রকাশিত হল। 'শ্রেষ্ঠ' কথাটি বাচ্যার্থে নয়, প্রচলিত অর্থেই গ্রহণীয়। আমার কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ছয়। 'অষ্টাদশী' [অগ্রহায়ণ ১৩৪০ / নবেম্বর ১৯৩৩], 'কলেজ-বয়' ছদ্মনামে লেখা 'ব্ল্যাকবোর্ড' [শ্রাবণ ১৩৪৮ / আগস্ট ১৯৪১], 'ক্ষণ-শাশ্বতী' [পৌষ ১৩৪৮ / ডিসেম্বর ১৯৪১], 'প্রেমকে মৃত্যুকে' [শ্রীপঞ্চমী ১৯৪১ / ফেব্রুয়ারি ১৯৪১], 'একটি আলোর পাখি' [শ্রাবণ ১৩৪০ / আগস্ট ১৯৩৩], এবং 'লোকায়ত' [শ্রীপঞ্চমী ১৩৪০ / ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩]। প্রথম কাব্য-গ্রন্থের কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। আঠারো অক্ষরে প্রতিটি চরণ, আঠারো চরণে প্রতিটি কবিতা। এ-রকম আঠারোটি কবিতায় গ্রন্থ সমাপ্ত। বিষয়বস্তু ছিল : 'আমার প্রিয়ার তনু অষ্টাদশ বসন্তের দান।' তাই গ্রন্থের নাম ছিল অষ্টাদশী। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাব্যগ্রন্থে আছে বিচিত্র ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কিন্তু প্রথম তিনখানি কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে শেষের তিনখানির ব্যবধান দুই যুগের অধিক কালের। বস্তুত, আমার সম্পাদিত 'কবি ও কবিতা' [১৯৪১-১৯৪৭] প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন আকারে কাব্যরচনার জোয়ার এসেছিল। 'কবি ও কবিতা'য় 'একগুচ্ছ নতুন ফসল' গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হয়ে 'প্রেমকে মৃত্যুকে' প্রকাশিত হয়। 'একটি আলোর পাখি' অবশ্য দুই যুগের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছে। তাই 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' শুরু হয়েছে 'একটি আলোর পাখি'র কবিতা দিয়ে। ওতে ১৯৪৭ সাল ও তার পরবর্তী কালের কবিতা সংকলিত হয়েছে। প্রকরণের দিক দিয়ে প্রথম যুগের কবিতার সঙ্গে দ্বিতীয় যুগের ব্যবধান দুস্তর। তাই প্রথম যুগের আটটিমাত্র কবিতা 'যৌবনবেদনারসে' শীর্ষক পরিশিষ্ট অংশে বিন্যস্ত হয়েছে। ছন্দ-সংগীতে উচ্ছ্বসিত তরুণ যৌবনের হৃদয়াবেগ এই কবিতাগুলির আলম্বন। দ্বিতীয় যুগে এই উচ্ছ্বসিত ভাষণ বর্জিত হয়েছে। কবিতা হয়েছে সংযত ও স্বল্পভাষী। উদাহরণ হিসাবে 'লোকায়ত' কাব্যগ্রন্থের 'কবিতাকে' শীর্ষক কবিতাটি উদ্ধার করা যেতে পারে :

> পাথর-বসানো সোনা খুলেই ফেলেছ,
> রঙিন শাড়ি ও জামা প'র না এখন,
> প্রসাধনে নেই আর মাদক সুরভি।

বাণীও বক্রোক্তিভরা,
অনুরক্তি প্রতীকী ভাষণে।

তবু তুমি
শুধু তুমি
প্রতীক্ষা আমার

সুতনু কবিতা।

এই 'সুতনু কবিতা'ই বোধ হয় আমার পরিণত কাব্য-কবিতার পরিচিতি। সমসাময়িক কালে বাঙলা কাব্যলোকে 'সুতনু কবিতা' প্রচুর লেখা হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু বক্রোক্তিভরা বাণী এবং প্রতীকীভাষণে অনুরক্ত কাব্যকলা সহজলভ্য নয়।

২

আমি কবিকে বলেছি 'ভোরের বাউল'। মন্বন্তরের অবসানে নব-প্রভাতের আগমনী-গানই তার মুখ্য জীবন-সংগীত। মহাকাল সৃষ্টি ও ধ্বংসের অধিকর্তা। ধ্বংসের পরে নবসৃষ্টি। ভোরের বাউল এই নবসৃষ্টির উদ্‌গাতা। শিশিরে কোমল নিশান্তের নির্জন প্রান্তরে সে দেখে :

সংহার-ত্রিশূলে মাথা রেখে
মহাকাল
একফালি চাঁদের দর্পণে
অর্ধনারীশ্বর।'

অশিব-বিনাশের প্রেরণায় সে প্রবুদ্ধ হতে চায়। তাই তার প্রার্থনা : 'আমাকে তোমার কবি কর'। 'আদি-সৃষ্টি'র প্রত্ন-রূপকল্প বা প্রত্নকল্প ব্যবহার করে সে বলে :

'তমসার প্রসন্ন সলিল / হিংসাসক্ত নিষাদের ক্রূর শরাঘাতে / ক্রৌঞ্চমিথুনের রক্তে নিত্যকলুষিত, / তবু আমি ভৎ্সনার ভাষা ভুলে যাই।... / অভিশপ্ত শতাব্দীর আর্তনাদ / আমাকে তো কাঁদাতে পারে না। / আমিও ওদের দলে / মূঢ় গড্ডলক।'

তাই সে বলে, 'আমাকে প্রোথিত কর বল্মীকের উর্বর মাটিতে, / আমি কণ্ঠে রামনাম নেব।'

আমার জীবনদর্শন ভাষা পেয়েছে 'অহন্যহনি', 'ভুবনডাঙার পথ' এবং 'মায়াদণ্ডে বিকশিত' প্রভৃতি কবিতায়। 'অহন্যহনি' কবিতাটি সমগ্রভাবেই উদ্ধারযোগ্য :

'মৃত্যুকে খাঁচায় পুরে / যতখুশি দানাপানি দাও / ভুলবে না। / মেলা ভেঙে গেলে / ধুলোর তুলোটে / মানুষের পদচিহ্ন / শ্বাপদ-নখরে / হিজিবিজি। / তবু জীবনের মানে / মৃত্যুকে খাঁচায় পুরে রাখা।' জীবসত্তা ও মানবসত্তার নিরন্তর দ্বন্দ্বই মানবজীবন। এর অনিবার্য পরিণাম মৃত্যু। 'তবু জীবনের মানে মৃত্যুকে খাঁচায় পুরে রাখা'।

'ভুবনডাঙার পথ'-এ আছে জীবসত্তা ও মানবসত্তার বোঝাপড়া। জীবনের পথে অন্নময় কোষের রসদও আছে, আবার আছে আনন্দময় কোষের সুচারু শিল্পকলা। ভুবনডাঙার পথ মানবজীবনের পথের প্রতীক হয়েছে। 'শিল্পে আর স্বাদু মাংসে' সে-পথ 'নির্বিকার চলে গেছে জনপদ পেরিয়ে পেরিয়ে।'

'মায়াদণ্ডে বিকশিত' কবিতাটি বিবর্তনশীল মানবজীবনের সারাৎসার। জীবসত্তাকে পরাভূত করে মানবসত্তার বিজয়-বৈজয়ন্তী :

জীবজীবনের প্রান্তে আরো এক জন্ম আছে—
বহু জন্ম জন্মান্তর পার হয়ে হয়ে
সুরভিত সত্তার গভীরে
ফল হয়ে ওঠা।

৩

আমার মানসলোকে সমাজচেতনার প্রতিনিধি হিসাবে দুটি কবিতার উল্লেখ করা যেতে পারে,— 'পদ্মদিঘির পাড়ে' এবং 'কালের কড়চা'। একটি স্তবকে গড়া 'পদ্মদিঘির পাড়ে' কবিতাটি ব্যঞ্জনাগর্ভ :

পদ্মদিঘির পাড়ে এখন তিনটে কুকুরছানা
জৈবক্ষুধায় সকাল-সন্ধে চেঁচায়
পদ্মদিঘির পাড়ে এখন ফেরিওয়ালার হাতে
পরীর শিশু প্লাস্টিকেতে গড়া।

'এখন' শব্দটি তখনকার কালকে আভাসিত করছে। তখন কী ছিল, আর এখন কী হয়েছে। 'কালের কড়চা' কবিতায় আছে অনুরূপ স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী। 'হাঁটুতে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা খোঁড়া পায়ে চলেছে সময়।'

... ...

ছেঁড়া ইতিহাসের পাতায়
অঢেল পেট্রল ঢেলে
বেপরোয়া যুবকের দল
বিপ্লবের আগুন পোহায়।

সে আগুনে পুড়ে ছাই রূপকথার ক্ষীরের পুতুল।

এই দুই কবিতায় আছে সমাজচেতনার নঙর্থক দিক। সদর্থক দিকও আছে। এই যুগ বিশেষভাবে মানুষের আকাশ-বিজয়ের যুগ। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যার দৌলতে সে পেয়েছে দুখানি অলৌকিক পাখা। এই দুখানি পাখা মেলে সে অনায়াসে মর্ত্যসীমা চূর্ণ করে মহাকাশের অভিযাত্রী হয়েছে। আকাশ থেকে পৃথিবীকে দেখার বিশ্বদৃষ্টি পেয়েছে নতুন মাত্রা। 'আকাশপথে' কবিতায় বিমানে চড়ে কয়েক হাজার ফুট উঁচু থেকে সে দেখেছে 'আকাশ-শিল্পীর আঁকা অপূর্ব সুন্দর চিত্রশালা, এই বসুন্ধরা'। বহু নিম্নে ভেসে আছে সাদা সাদা মেঘের পাহাড়। মনে হয় রাশি রাশি পেঁজা তুলো ভেসে যাচ্ছে। তারি ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে শাশ্বতযৌবনা তন্বী শ্যামা এই পৃথিবীকে। চোখে পড়ে 'কুটিল পদ্মার বুকে পিঙ্গল বালুর চর / নক্সা কাটা-কাটা। / যেন বা উপুড়-করা সমুদ্রের বিশাল ঝিনুক। 'যেতে যেতে হঠাৎ ভেসে উঠেছে ফসল-মাঠের জমি :

> মোজেইক-করা যেন সাজানো পাথর।
> সবুজে হরিতে মিলে কী বিচিত্র রঙের বাহার!
> ফ্রেমে-বাঁধা ল্যাণ্ডস্কেপ অবনীন্দ্র ঠাকুরের আঁকা।

আকাশচারিতা মানুষকে দিয়েছে সৌন্দর্যদর্শনের এই নতুন দৃষ্টি। বোয়িং সোয়ান হয়েছে 'হংসদূত'। একালের হংসদূত / দূরকে নিকট করে, / পরকে আপন।' শতাব্দীর কবিসত্তাও যেন হংসদূত। তাই বলা হয়েছে :

'তোমার মানসহংস / মিলনের বিশ্বদূত, / পাখায় প্রেমের হাওয়া নিয়ে / উড়েছে আকাশপথে / দেশে দেশে / কালে কালে / মানুষে মানুষে।'

'নভশ্চর'কে সম্বোধন করে নতুন জিজ্ঞাসা জেগে উঠেছে : 'তুমি তো আকাশে ভেসে যাও, / ওরা থাকে আদিম নিবাসে। / তুমি খোঁজো আকাশের মাটি / ওরা দেখে মাটির আকাশ। / পৃথিবীর সীমানা আকাশ / আকাশের সীমানা তো নেই। / মানুষের সীমা মানুষতা / সে সীমা কি পেরোবে এবার?' মানুষের সীমা 'মানুষতা'; মনে হচ্ছে বিবর্তনের পথে সে-সীমা পেরোবার লগ্ন যেন আসন্ন।

এই যুগের আরেকটি লক্ষণ—নিসর্গলোকের সীমা সম্প্রসারিত হয়েছে আকাশে আকাশে। 'নৈসর্গিক' কবিতায় দেখা যায়, বিস্ময়ঘন পৌরাণিক পাখির বাঁশুরিয়া কণ্ঠে যে-যন্ত্রসংগীত বাজছে, তা শুনছে আকাশরসিক যত নক্ষত্রের দল। আর 'দেবতার মহিমা হারিয়ে / পূর্ণচন্দ্র / বিশ্বযানী মানুষের অন্তরঙ্গ প্রাণের দোসর' হয়ে উঠেছে।

৪

সমাজসচেতনতা প্রসঙ্গে দুটি প্রতীকী কবিতার প্রতি সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি : 'প্রেয়সী' এবং 'অধিশাস্তা'। 'প্রেয়সী' মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতীক, 'অধিশাস্তা' উচ্চবিত্ত সমাজের। প্রেয়সীতে মধ্যবিত্ত জীবনের ইতিবৃত্ত উত্তম-পুরুষের বাচনিকে বিবৃত :

যে-অটল ভিত্তিমূলে সভ্যতার শাশ্বত আশ্রয়
আজ দেখি সে-ভিত্তির চোরাবালি ধসে ধসে পড়ে,
যে সুন্দর সৌধতলে স্বপ্ন ছিল পূর্বপুরুষের
বিবর্ণ সে সৌধগাত্রে পঞ্জরাস্থি পড়েছে বেরিয়ে।
অতীত হয়েছে মিথ্যা, ভবিষ্যৎ দূর-মরীচিকা,
ভূত-ভবিষ্যৎ-হারা অট্টহাসি আমরা সৃষ্টির ;
মগজের আভিজাত্যে ঘৃণা করি ইতর মজুরে,
কাঙাল নয়নে চাই ঊর্ধ্বমুখে ধনীর প্রাসাদে।

মধ্যবিত্তের আত্মকথা সমাপ্ত হয়েছে করুণ পরিণামের সংকেত দিয়ে :

আসন্ন ধ্বংসের মুখে সহযাত্রী মরণ-সঙ্গিনী,
প্রলয়ের অন্ধকারে কণ্ঠলগ্না আমার প্রেয়সী।

বল্গাহীন সম্ভোগলিপ্সু উচ্চবিত্ত জীবনের প্রতিচ্ছবি আঁকা হয়েছে 'অধিশাস্তা' কবিতায়। বহুতল মর্মরপ্রাসাদে হীরকখচিত রত্নবেদী। স্বর্ণসিংহাসনে নবকুবেরের লক্ষ্মী অচঞ্চলা। নাটমঞ্চে স্তরে স্তরে খসে পড়ে সভ্যতার সুচারু নির্মোক। প্রেক্ষাগারে বিত্তেশকুলের পরকীয়া বাসনাসঙ্গিনী। রজনীর মধ্যযামে, নিয়নের মধুচন্দ্রিকায়, শুরু হবে মদনের মহোৎসব-লীলা। নিষিদ্ধ সেই লীলার সাক্ষী অধিশাস্তা বা **Super-Ego**। কিন্তু তার অনুশাসন ব্যর্থ। কবিতার সমাপ্তিতে সেই ব্যর্থতাই ভাষা পেয়েছে :

অরসিক সেই বৃদ্ধ
কামনার মোক্ষধামে
বৃথা জাগে অতন্দ্র প্রহরী।

৫

কাব্যের প্রকরণ তথা শিল্পকলা সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। কবিতাগুলিতে প্রত্নকল্পের প্রতি প্রবণতা লক্ষ করার বিষয়। এই প্রসঙ্গে 'লোকায়ত', 'পক্ষিজাতক',

'শ্রাবণ', 'শরৎ', 'প্রেম : হাজার বছর আগে' এবং 'রাধা' প্রভৃতি কবিতা আলোচিতব্য।

বৈদিক যুগে বলা হয়েছে, দ্যাবা পৃথিবীর মিলনে পতিত বৃষ্টির জলে শস্যের উদ্ভব হয়। মিলনের এই প্রত্নকল্পটি রূপায়িত হয়েছে 'লোকায়ত' কবিতায় :

বঙ্গোপসাগর থেকে
গাঙ্গেয় বদ্বীপে
বীর্যবান আকাশের ধারা নেমে এল।
আকাশ ও বসুধার প্রথম সংগম,
মাটির সোঁদাল গন্ধে বাতাস মাতাল হল যেন।

কৃষিসভ্যতার এই আদিম সত্য যে লোকায়ত জীবনের অন্তরঙ্গ উপলব্ধিতে জীবন্ত হয়ে আছে, তারই কথা বলা হয়েছে কৃষ্ণনগরের বিজ্ঞ চাষীর কণ্ঠে :

মেয়ের আমার
সবে তো ভেঙেছে লজ্জা!
আরো ক'টি বর্ষণের পরে
হাল চালাবার কাজে তৈরি হবে ফসলের জমি।

পাশ্চাত্য পুরাণে আছে ফিনিক্স [Phoenix] পাখির কথা। সেই প্রত্নকল্প দিয়ে গড়া হয়েছে 'পক্ষিজাতক' কবিতাটি। তার পুনর্জন্মের যন্ত্রণার ইঙ্গিত আছে দ্বিতীয় স্তবকে : 'জৈবতাপ কোমল পালকে ঘষে ঘষে / আত্মদাহী অগ্নি-উজ্জীবন।' তারপরে আছে কবিতার অন্তর্গূঢ় ব্যঞ্জনা :

দপ্ করে জলে ওঠে কালের কুলায়—
রক্তিম শিখায় জ্বলে রাত্রির আকাশ।

উজ্জ্বল ধবল দুটি বিশাল ডানায়
নিশান্তের সেই পাখি আবার আকাশে উড়ে যায়।

'কালের কুলায়' এবং রাত্রির আকাশে 'রক্তিম শিখা' ধ্বংসোত্তর নতুন সমাজ ও সভ্যতা-প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিতবহ।

প্রকৃতির বর্ণনায়ও প্রত্নকল্পের প্রয়োগে নিসর্গচেতনা মানবিকতার রসে জারিত হয়েছে। 'শ্রাবণ' কবিতায় এসেছে রামায়ণের শবরী :

আমার শ্রাবণ
গলায় অশ্রুর মালা
অসিতাঙ্গী শবর-রমণী।

জাতিস্মর।

সিতাসিত দুই পক্ষ চেতনায় অবলুপ্ত করে
আকাশ-ভুবন মেঘমল্লারে দোলায়।

'জাতিস্মর' কথাটিতে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের জন্ম-জন্মান্তরের ইতিহাস আভাসিত হয়েছে।

'শরৎ' কবিতাটি সাংকেতিকতায় ঘনীভূত। বাঙালি জীবনে শরৎ-এর সঙ্গে শারদীয় পূজা ওতপ্রোত। প্রথম বাক্যে আকাশে শরতের আবির্ভাব উচ্চারিত : 'সাদা পালে দিন ভেসে যায়'। দ্বিতীয় স্তবকে আছে মর্ত্যলোকের সঙ্গে অন্তরীক্ষের যোগাযোগের কথা। পৃথিবীর 'সবুজ' যেখানে আকাশের 'নীল'-এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে 'সেখানে আকাশ / পৃথিবীর কোলে এসে শিশু'। শারদীয় পূজায় জগজ্জননী হন ঘরের মেয়ে। তৃতীয় স্তরে মানবজীবনে তারই প্রতিফলন :

প্রতিবেশী গৃহস্থের ঘরে
সোনার প্রতিমা বধূ
দুচোখে কাজল।

শ্বশুরঘর থেকে বধূ যাবে বাপের বাড়ি—'দুচোখে কাজল' তারই প্রস্তুতির সংকেত।

প্রেমের কবিতায় প্রত্নকল্পের প্রয়োগ আছে 'প্রেম : হাজার বছর আগে' এবং 'রাধা' কবিতায়। প্রথমটিতে আছে বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহজিয়াদের সুখবাদের শিল্পরূপ, দ্বিতীয়টিতে আছে সহজিয়া বৈষ্ণবীয় প্রেমের প্রত্নপ্রতিমা।

... ...

বলা প্রয়োজন, এই ভূমিকা রচনার উদ্দেশ্য হল কৌতূহলী পাঠকের কাব্যাস্বাদনের অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি করা। চলিতভাষায় যাকে বলে খেই ধরিয়ে দেওয়া। প্রকৃত রসিকের কাছে তা অনাবশ্যক।

ভোরের বাউল

জীর্ণবস্ত্র রঙিন সুতোয় রিপু ক'রে
শিল্পিত-গেরুয়া-পরা
ভোরের বাউল।

একতারা হাতে নিয়ে
ঘুঙুরের বোল তুলে পথের মাটিতে
বিস্ময়ে অবাক্।

নিশান্তের নির্জন প্রান্তর
শিশিরে কোমল হয়ে আছে।

সংহার-ত্রিশূলে মাথা রেখে
মহাকাল
একফালি চাঁদের দর্পণে
অর্ধনারীশ্বর।

স্বপ্ন

দুপাশে সোনালি শস্য—আদিগন্ত থৈ থৈ মাঠ,
শস্পশ্যাম গোচারণে পরিতৃপ্ত শ্যামলী ধবলী,
বটের পাতারা নাচে রাখালের মুরলীর সুরে।

মধ্যভাগে রাজপথ টক্‌টকে লালস্বপ্নে মোড়া,
আশ্‌মানি আকাশপটে ছবি-আঁকা চিম্‌নির পেন্সিলে,
দানবের যন্ত্রপুরী মানবের সেবায় দীক্ষিত।

অরুগ্ন বলিষ্ঠ যুবা দৃপ্তপদে চলে রাজপথে,
অফুরন্ত শ্রমশক্তি উচ্ছ্বসিত ইস্পাত-পেশীতে,
নয়নে নক্ষত্ররশ্মি, ওষ্ঠাধরে অপ্রমত্ত প্রেম।

কদম্‌ কদম্‌ চলে পাশে পাশে সঙ্গিনী যুবতী,
স্বাস্থ্যের অজস্রদানে বেপরোয়া যৌবন-হিল্লোল,
বুকের যুগলভাণ্ডে অনিঃশেষ সুরভির সুধা,
নিটোল বাহুতে বাঁধা কোলজোড়া শিশুর উল্লাস।

তোমাকে প্রণাম করি জন্মভূমি আমার জননী।

সুন্দরবনের ডাকে

কাজল দিঘির জলে নয়,
সবুজের সমারোহে
লক্ষ লক্ষ শ্বেতপদ্ম ফোটে।

আদিম অরণ্যতলে
ওৎ পেতে বসে থাকে
ডোরাকাটা মরণের দূত।

বনবিবি ক্ষিপ্ত হলে ডেকে আনে সমুদ্রের ঝড়,—
গাছে গাছে আকাশের ওঠে হাহাকার;
কম্পিত কুলায় থেকে
অসহায় শিশুগুলি
ফলের মতন ঝরে টুপ টুপ টুপ।

কচি মাংসে উষ্ণ রক্তে কী স্বাদু পশুর প্রাতরাশ!

তবু ওই যাযাবর প্রবাসী পাখিরা
সুন্দরবনের ডাকে উড়ে আসে মৌসুমি হাওয়ায়।
বাসা বাঁধে
ডিম পাড়ে
শ্বেতপদ্ম ফোটায় আকাশে।

নবজাতক

কড়া খাড়া লোম ঘাড়ে,
মেটে সাদা শুয়োরের দল
ঘুরে ফেরে বেওয়ারিস মাঠে।
কুশ্রী জীব, কদর্য গড়ন ;
সাদা ঘাঁটে, নোংরা খায়,
জুগুপ্সা জাগায়।

ওরি মাঝে
দেখো দেখো, কী আশ্চর্য দুটি ছোট ছানা। —
গোলাপী ফুলের রং তুল্‌তুলে তুলো দিয়ে ঢাকা।
তুর্‌তুরে চার পায়ে নেচে নেচে চলে।
পায়ের পাথায় যেন মাটির আকাশে উড়ে যায়।
উড়ে যায় গান হয়ে,—শব্দহীন জীবনের গান

ওরা আগন্তুক,
মর্তের মাটির বুকে প্রাণের আনন্দ ওরা,
নাচের পুতুল।

দেখো দেখো
কী সুন্দর,
খোলা মাঠে খেলা করে নবজাত শুয়োরের ছানা।

আকাশপথে

আঁকাশ-শিল্পীর আঁকা
অপূর্ব-সুন্দর চিত্রশালা
এই বসুন্ধরা,—
শিশু-বিধাতার খেলাঘর।

বহু নিম্নে ভেসে আছে
সাদা সাদা মেঘের পাহাড়।
মনে হয় রাশিরাশি
পেঁজা তুলো শূন্যে উড়ে যায়।
তারি ফাঁকে চোখে পড়ে
তন্বী-শ্যামা আমার পৃথিবী
শাশ্বতযৌবনা।

কোথাও বা শহরের রয়েছে মডেল,
কোথাও মাঠের বুকে সবুজ গাঁয়ের ছবি আঁকা,
কালো কালো বিন্দুগুলি মানুষের সত্তার সংকেত

কোথাও বা মামণির চুলের নীলচে ফিতে—
আঁকাবাঁকা নদী।
কুটিল পদ্মার বুকে পিঙ্গল বালুর চর
নক্‌শা কাটা-কাটা।
যেন বা উপুড়-করা সমুদ্রের বিশাল ঝিনুক,
অথবা বিরাট তিমি বালুজলে ল্যাজ উঁচু-করা।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখ
ফসল-মাঠের জমি
মোজেইক-করা যেন সাজানো পাথর।
সবুজে হরিতে মিলে কী বিচিত্র রঙের বাহার!
ফ্রেমে-বাঁধা ল্যাণ্ডস্কেপ অবনীন্দ্র ঠাকুরের আঁকা।

সমতল মাঠগুলি নিমেষে হারিয়ে যায়
ঘননীল অরণ্যের বুকে।
শুরু হয় সানুমান পর্বতের চড়াই উৎরাই।
গারো-পাহাড়ের মাথা
কাফ্রির চুলের মতো
কুঞ্চিত মসৃণ।
যেন বা অগুনতি হাতী দল বেঁধে চলেছে কোথায়—
তাদের পিঠের মতো
ধুম্রবর্ণ আসামের অসংখ্য পাহাড়।
চলার পথের দড়ি আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে তাদের;
কোথাও শিখরে চ'ড়ে
দেখেছে নগাধিরাজ দেবতাত্মা নয়,
গিরিশৃঙ্গ মানুষেরি নির্ভীক নিবাস।

তারো উর্ধ্বে
কয়েক হাজার ফুট শূন্যপথ পরিক্রমা করে
মধ্যবিংশ শতাব্দীর নবমেঘদূত।

খ্রীস্ট-জন্মদিনে

খুলে দাও রুদ্ধ দ্বার
বাতায়ন মুক্ত করে দাও।
কেটেছে শীতের রাত
শেষ হয়ে এসেছে আঁধার।
আলোর মহল খুলে
হাসিমুখে এসেছে অতিথি।

শুভ্রবৈদ্য

রাত চারটে।
সূর্যের ঘুম ভাঙে নি,
ওদের ভেঙেছে।
শেষরাতের নিস্তব্ধ অন্ধকারে
ভেসে আসছে ওদের জীবনসংগীত।

ভোরের সূর্য যখন ওদের মুখে
আলোর আদর পাঠাবে
তখন ফুটবে ওদের রূপ—
ঝিলের ধারে
আধ-হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে
শীর্ণ পিঠকে ধনুক ক'রে
কাঠের পাটার বুকে ওরা জীবনের গান বাজায়
বসন-পরিশোধনের গান।

সভ্য মানুষের সনাতন শিল্পী ওরা—
মালিন্যকে অমলিন করার বৈদ্য।

শেষরাত থেকে ভোর,
ভোর থেকে সকাল,
সকাল থেকে দুপুর যায় গড়িয়ে—
তবু ওদের কাজের বিরাম হয় না।
দুটি পেশল বাহুর মায়াস্পর্শে
শূন্যে পূর্ণ একটি বৃত্ত রচনা ক'রে
কাপড়ের মালা আছড়ে পড়ে কঠিন পাটার বুকে!

ধীরে ধীরে তার রঙ বদলায়,
বারবার জলে গা ধুয়ে
দেহে লাগে সিক্ত রোদের শুভ্রতা।
পৃথিবীর মাটি হয় আকাশের আলো।

বেলা পড়ে এলে
বিকেলের প্রসন্ন আলোয়
একবার ওদের দিকে তাকাও।—
ধরজির যুগল-লতায় অসংখ্য ফুল ফুটেছে,
হাওয়ায়-দোল-খাওয়া দুধসাদা একরাশ ফুল
ওই ফুল গায়ে জড়িয়ে বাবুরা ফুলবাবু হয়।

জাল

পালাবার পথ নেই,
ওৎ পেতে বসে আছে অব্যর্থ শিকারী।

হরিণচরণে ছুটে যাবে ?
উড়ে যাবে ঈগল-পাখায় ?

তার জালে ছিদ্র নেই,
সারাটা গগনবেড় জাল।

কাশী মিত্তির ঘাটে

বিকেলের আকাশে মেঘের চিতায় সূর্য পুড়ছিল।
গঙ্গার কাশী মিত্তির ঘাটে তার প্রতিবিম্ব দেখলাম

কত বিদগধ জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।
কহ কবিবল্লভ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক॥

তুমি ছিলে সেই একলাখের একজন।
পরিশীলিত পাণ্ডিত্যের পরিচ্ছন্ন পোশাকে
রসের সাগরে ডুব দিয়েছিলে।
তুমি প্রেমিক। তুমি রসিক। তুমি কবি।

নিঃসঙ্গ শ্মশানশয্যার পাশে ব'সে ভাবছি,
তোমার যৌবনের লীলাসঙ্গীরা আজ কোথায়?
প্রৌঢ়প্রজ্ঞার প্রিয়শিষ্যরা?

হায় রে হৃদয়
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।

মাঘের গোধূলি ঘনিয়ে আসছে।
কালের হাওয়া লেগেছে ভাগীরথীর হিমেল প্রবাহে।
এই হাড়-কাঁপানো শীতে প্রাণের উষ্ণস্পর্শ পাচ্ছি
তোমার মর্ত্যলীলার শেষরশ্মিতে।

অগ্নিজিহ্বায় দেহরস পান ক'রে
শ্মশানমালঞ্চে ফুটে উঠছে অসংখ্য স্বর্ণচাঁপা।

আকাশে তাকিয়ে দেখি
মেঘাবরণমুক্ত সূর্য অস্তদিগন্তে চিরজ্যোতির্ময়।

স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুল

বন্যায় ডুবেছে দেশ
তবু তো শরৎ এলো বিষণ্ণ আকাশে।

মৃত্যুর দুঃস্বপ্ন-ঘেরা ভয়ংকর রাত ছিল কাল,
হঠাৎ নিশুতি ঘুমে আর্তস্বরে ডেকে উঠলো কাক।

কালিন্দীর দুই তীরে,
পঞ্চগ্রামে,
ভুবনপুরের হাটে,
অন্ধকার—
শুধু অন্ধকার।

বিলাসের রঙ্গশালা থেকে
একটি একটি ক'রে
জলসাঘরের আলো
নিবে যায়।
জীবনমশায়
অধ্রুব আরোগ্যনিকেতনে
বৃথা খোঁজে জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর নিদান।

ওদিকে দিগন্তজোড়া মাঠে
অরণ্যপ্রান্তর থেকে ভেসে আসে
সবুজে-হলুদে মিনে-করা
হাঁসুলীবাঁকের উপকথা।
নাগিনীকন্যার কাহিনীতে
উলঙ্গ প্রাণের নৃত্য দেবতার নিষিদ্ধ দেউলে।

কালের পুতুল ওরা
মৃত্যুর প্লাবনে ডুবুডুবু।

তবু রাত ভোর হয়।
পুবের আকাশে ভাসে বৃন্তহীন সোনার কমল
তারি আলো চোখে নিয়ে,
মৃত্যু নয়,
জীবনের জয়ধ্বনি করে
স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুল।

চতুষ্ক

পৃথিবী-তমসাতীরে ক্রৌঞ্চমিথুনের নিধুবনে
মহাকাল-নিষাদের নিত্য ছোটে মৃত্যুর শায়ক ;
আমার বুকের নীড়ে ভীরু পাখি কাঁপে প্রতিক্ষণে,
আমি মহাকবি নই, আমি এক ট্র্যাজেডি-নায়ক।

আলোর মরাল

দুর্যোগের মেঘে-ঢাকা কৃষ্ণপক্ষ রাত ছিল কাল।
কালবোশেখির ক্রোধ ক্ষিপ্ত ছিল পল্লীনিকেতনে,
শেষ-বসন্তের কান্না ঝরেছিল নারিকেল-বনে,
অশুভ কী আশংকায় বিশ্ব ছিল বীভৎস ভয়াল।
প্রসন্ন আকাশে আজ আনন্দিত এসেছে সকাল—
সে যেন স্বর্গের শিশু, দুধে-দাঁতে হাসে ক্ষণে ক্ষণে,
মর্ত্যবালিকার খুশি দোল খায় পুবালি পবনে ;
দূর-শূন্যে উড়ে যায় শ্বেতশুভ্র আলোর মরাল।

'তুমি দূরে চলে গেলে জীবন আঁধার হয়ে আসে',—
বলেছিলে কাল রাতে যন্ত্রণার বিষণ্ণ ভাষায়,
কপোলে মুক্তোর মালা ঝরেছিল বুকের আঁচলে।
আজ ভোরে ঘুম ভেঙে কণ্ঠ জাগে ললিতে-বিভাসে,
অধর তৃষিত হয় কী নব জীবন-পিপাসায় ;—
প্রিয় দূরে চলে যায়, প্রেম তবু হাসে পূর্বাচলে ;

আমার নায়ক

সেও তো মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে বাঁচতে চেয়েছে।
রুদ্ধশ্বাস দ্বৈরথ-সমরে
যৌবন সহায় ছিল তার।
প্রেম এসে বলেছিল,
তোমার পিপাসাপাত্র সুধা দিয়ে ভরে দেব আমি।

বক্রহাসি হেসেছিল মহাকাল—মৃত্যুর সারথি।

দুর্নিবার সময়ের চক্রতলে বিদলিত হয়ে
যৌবন বিদায় নিয়ে গেল ;
প্রেমের পানীয় হল বিষ।

জীবনের রঙ্গমঞ্চে যবনিকা ওঠে আর নামে।
শেষদৃশ্যে দেখা গেল
পথের ধুলোয়
মুখ থুবড়ে পড়ে আছে আমার নায়ক ;
পরাজিত,
তবু জানি পলাতক নয়।

শিবিরে শিবিরে

রাতের শিবির থেকে
দিনের শিবিরে—
সংগ্রামের হাতিয়ার
দুই হাতে নিয়ে
সাজবদলের পালা
ঘড়িতে ঘড়িতে।

পয়োমুখ পড়োশির নিপুণ মুখোশে
বহুশীর্ষ সমাজের উচ্চাবচ সোপানে সোপানে
স্বর্গাদপি স্বদেশের এপারে ওপারে
অগণন
অশ্ব গজ রথী পদাতিক।

দিনের শিবির থেকে
রাতের শিবিরে—
অন্ধকার ঘন হয়ে এলে
প্রতিপক্ষ আসে আরো কাছে।
অস্তিত্বের আলো-আঁধারিতে
আমাকে দুভাগ ক'রে শুরু হয় সম্মুখ-সমর।

নিষ্ক্রমণ

মুক্তির পথ তো খোলাই ছিল,—
মহাকালই খুলে রেখেছেন।
তবে, কেন অমন করে চলে গেলে ?

বেদনায় কাঁদলে না,
কাঁদালেও না।

রঙ্গমঞ্চে আবার যবনিকা পড়ল ;
প্রেক্ষাগৃহ ভেসে গেল প্রহসনের অট্টহাসিতে।

যুগ্মক

আমারি প্রাক্তন স্বপ্ন, পথে দেখা, এলো কাছাকাছি—
শুধালো, 'আছেন ভালো ?'—ম্লান হেসে জানালাম, 'আছি'

কালের কড়চা : ১৯৭০

হাঁটুতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, খোঁড়া পায়ে চলেছে সময়।

পৃথিবীর আদিম জঙ্গলে
নেমেছে শীতের সন্ধ্যা,
কুয়াশায় ঢেকে গেছে পথ।

ছেঁড়া ইতিহাসের পাতায়
অঢেল পেট্রল ঢেলে
বেপরোয়া যুবকের দল
বিপ্লবের আগুন পোহায়।

সে আগুনে পুড়ে ছাই রূপকথার ক্ষীরের পুতুল।

সবাই যে যার ঘরে

সবাই যে যার ঘরে !

নিজের পুতুল নিয়ে,
অথবা পুতুল হয়ে অন্য কারো হাতে
দিব্যি শুয়ে আছে ।

আগুন লেগেছে কোথা ?
পুবের আকাশ জুড়ে কারা কাঁদে,
কারা যেন হাহাকার করে !
পশ্চিমের ভিটে-মাটি বসত-খামার
প্রলয়-বন্যায় বুঝি ভেসে গেল !

কতো লাখ এলো ওরা ?
পায়ে পায়ে আরো কত লাখ
আসছে কে জানে !

হে মোর দুর্ভাগা দেশ !...
এই ভেবে
বোবা-কান্না কেঁদে
সবাই যে যার ঘরে
নিজের পুতুল নিয়ে
অথবা পুতুল হয়ে অন্য কারো হাতে
পাশ ফিরে শোয় ।

বিদ্যুৎ-অধরে

বিদ্যুৎ-অধরে
আমাকে ছুঁয়েছ তুমি।
আমি আষাঢ়ের মেঘ জলভারনত,
আমাকে বিদীর্ণ কর সহস্র ধারায়।
মর্ত্যের আশ্লেষ-তৃষা
তৃপ্ত হোক্
আকাশ-সংগমে।

প্রেয়সী

রবীন্দ্রনাথের মতো প্রেমস্বপ্ন আমিও দেখেছি—
ময়নাপাড়ার মাঠে কৃষ্ণকলি হরিণনয়ন,
নবীন শ্যামল দেহে তমালের কালো কোমলতা
এনেছে বিনিদ্র রাতে আষাঢ়ের মেদুর বিরহ।
প্রেমের অমরাবতী উজ্জয়িনী নীবিমোক্ষ-ধাম,
সেখানে শিপ্রার তটে প্রেয়সীর সংকেত-ভবন,
মুখে-মাখা লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম-হাতে মালবিকা
মণিদীপদীপ্ত কক্ষে হাত ধরে ডেকেছে আমায়।

রবীন্দ্রনাথের মতো প্রেমস্বপ্ন আমিও দেখেছি—
আমারো যৌবন-স্বপ্নে ছেয়েছিল বিশ্বের আকাশ,
তবু স্বপ্ন সত্য নয়, রূঢ় রুক্ষ বাস্তব জীবন,
প্রতি পদে চূর্ণ হয় গজমোতি-মিনারবিলাস।
মধ্যবিত্ত গৃহস্থের দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামে
যে এল সঙ্গিনী হতে, আজন্মের মানসী আমার,
অর্ধেক রাজত্ব-হাতে রাজকন্যা মধুমালা নয়,
আমারি দোসর সে যে মধ্যবিত্ত-গৃহস্থদুহিতা।

শিশুকালে নদীকূলে সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে
শিবমূর্তি পূজা করে আমাকে সে করেনি কামনা ;
পল্লীর দুলালী নয়, শহরের পাষাণ-প্রাচীরে
বেড়েছে আড়ষ্ট প্রাণ নাগরিক কৃত্রিম রসদে।
যৌবন এসেছে দেহে কুমারীর অপরাধ হয়ে,
সলজ্জ সংকোচভরে ফ্রক ছেড়ে জড়ায়েছে শাড়ি ;
শহরের পথ বেয়ে ঘুরেছে সে ইস্কুল-কলেজে,
শিখেছে ইংরেজি-বিদ্যা শেষ অস্ত্র জীবন-সংগ্রামে।

তারপর একদিন উৎসবের বাঁশরী-সংগীতে
বেণী সুসংবদ্ধ ক'রে শিরে টেনে দিয়েছে গুণ্ঠন,
মঙ্গল-সিন্দুরবিন্দু পরেছে সে সীমন্ত-সীমায়—
এসেছে জীবনলক্ষ্মী লক্ষ্মীছাড়া মধ্যবিত্ত ঘরে।
প্রথম-মিলন-রাতে সলজ্জিত বাসর-শয্যাতে
কানে-কানে-ডাকা নাম কাব্য হতে এলো না স্মরণে,
'প্রেয়সী' অথবা 'প্রিয়ে'—মনে হল অসহ্য ন্যাকামি,—
সম্বোধন শুধু নয়, দাম্পত্যেরো নব-ইতিহাস।

ক্ষয়িষ্ণু সমাজবৃক্ষে শাখাশ্রয়ী স্বল্পপরিসরে
ভূমিসংস্রবহীন পরাশ্রিত প্রাণ আমাদের,
যুগান্তের ঝড় এলে ভ্রষ্টনীড় শূন্যে যাব উড়ে
কিংবা ভাগ্য ভালো হলে ফিরে পাব মাটির আশ্রয়।
আপাতত ভাড়া-করা দেড়তলা ফ্ল্যাটের ভাড়াটে,
দুখানি সংকীর্ণ ঘরে শুরু হয় সাধের জীবন ;—
উদয়াস্ত পরিশ্রমে অস্তিত্বের প্রাণান্ত সংগ্রাম,
জীবিকার অন্বেষণে তিলে তিলে জীবনের ক্ষয়।

অচল সংসারযাত্রা টেনে টেনে নাভিশ্বাস ওঠে,
অবশেষে রাজপথে আব্রুহীন শুদ্ধান্তচারিণী,
আপিসে কেরানি সেজে গৃহলক্ষ্মী চালায় সংসার,—
দুজনের উপার্জনে কোনক্রমে জীবধর্ম চলে।
অভাবে স্বভাব নষ্ট, খ'সে পড়ে বনেদি মুখোশ,
ক্রমশ ধাতস্থ হয় অন্ত্যজের অভদ্র জীবন,
ধনিক-বন্ধুর কাছে নিতে হয় করুণার দান—
জানি তা দাদন মাত্র বশংবদ শিকারের লোভে।

ইংরেজি কেতাবে শেখা স্বাধীনতা হয় স্বেচ্ছাচারী—
চিরকেলে সেবাদাসী দিনে দিনে স্বাধীন-জেনানা ;

আমার বর্বর রক্তে ক্ষেপে ওঠে আদিম পুরুষ,
তাকে আমি শান্ত রাখি সভ্যতার সামমন্ত্র পড়ে।
সন্দীপের মোহাকর্ষে উৎকেন্দ্রিতা আমার বিমলা,
আমি নিখিলেশ-শিষ্য, বন্দিনীর খুলেছি শৃঙ্খল ;
আমার বুর্জোয়া-তন্ত্রে উমা আর রাধার মিলন,
গৃহে বৃন্দাবন রচে আমি করি প্রেমের বিলাস।

'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' আমাদের অনাচরণীয়,—
অব্যাহত জীবলীলা দরিদ্রের ঘরে অভিশাপ,
জন্মনিয়ন্ত্রণে তাই দীক্ষা নিয়ে পাশ্চাত্য গুরুর
নিশ্চিন্ত আরামে চলে নিশীথের তমিস্র-বিলাস।
তবু চোখে অশ্রু নামে, কান্না শুনি ভাবী জাতকের,
আমার রক্তের মাঝে শুনি তার জন্মের প্রার্থনা,
দাম্পত্য-মিলনে কাঁদে মানুষের ভাবী বংশধর,
তবু তার মুক্তিপথ অবরুদ্ধ আমাদের শাপে।

যে-অটল ভিত্তিমূলে সভ্যতার শাশ্বত আশ্রয়
আজ দেখি সে-ভিত্তির চোরাবালি ধসে ধসে পড়ে
যে সুন্দর সৌধতলে স্বপ্ন ছিল পূর্বপুরুষের
বিবর্ণ সে সৌধগাত্রে পঞ্জরাস্থি পড়েছে বেরিয়ে।
অতীত হয়েছে মিথ্যা, ভবিষ্যৎ দূর-মরীচিকা,
ভূত-ভবিষ্যৎ-হারা অট্টহাসি আমরা সৃষ্টির ;
মগজের আভিজাত্যে ঘৃণা করি ইতর মজুরে,
কাঙাল নয়নে চাই ঊর্ধ্বমুখে ধনীর প্রাসাদে।

তবু মনে স্বপ্ন নামে বাস্তুহারা মধ্যবিত্ত ঘরে,
স্বপ্ন নামে শ্রান্ত চোখে, স্বপ্ন নামে ক্লান্ত ওষ্ঠাধরে,

সৃষ্টির প্রবাহ বেয়ে স্বপ্ন নামে নিস্তেজ শিরায়,
একই জীর্ণ শয্যাপ্রান্তে স্বপ্ন নামে ছুটি শীর্ণ দেহে।
জানি বন্ধ্যা, তবু সেই অভিশপ্ত স্বপ্ন দেখে দেখে
ব্যর্থ এ জীবনযুদ্ধে উভয়েরই এক পরিণাম—
আসন্ন ধ্বংসের মুখে সহযাত্রী মরণ-সঙ্গিনী,
প্রলয়ের অন্ধকারে কণ্ঠলগ্না আমার প্রেয়সী।

অনুচ্চারিত

এস্‌প্ল্যানেডের মোড়ে থেমে গেল ডবল-ডেকার,—
নব-অনুরাগবতী পাশে বসে ছিলে একাসনে ;
সম্মুখ-যুবার চোখে নগ্নক্ষুধা রমণী দেখার,—
তোমার জ্বলন্ত ঘৃণা ফুটিয়াছে কটাক্ষ-শাসনে।

বাঁ-দিকে গড়ের মাঠ, ডানদিকে চৌরঙ্গির ভিড়,
তার মাঝে তুমি-আমি পাশাপাশি বসে মৌনমুখ ;—
মন কি আকাশে ওড়ে, অথবা সে গড়ে স্বপ্ননীড়,
ফোটে কি হৃদয়-পদ্ম, কণ্ঠ তবে কেন থাকে মূক ?

ভিক্ষাপাত্র তুলে ধরে ভিক্ষা চায় ভিখারী-বালিকা,—
'একটি আধ্‌লা দে মা !'—অঙ্গে তার মূর্ত অনশন ;
ধনীর লাঞ্ছনা দিয়ে রচা তার ম্লান দৃষ্টিশিখা,
বঞ্চনার গূঢ়ফণা কণ্ঠ তার করিছে দংশন।

মায়ের না পেয়ে দয়া ফিরালো সে মোর পানে চোখ,
কহিল কাতর কণ্ঠে 'দে না বাবা !'—ছুটি মাত্র কথা ;
কিন্তু এ কি বলিল সে ! মিলনের এ কি নবশ্লোক !
ছুটি মাত্র সম্বোধনে উচ্চারিত ভবিষ্য-বারতা !

অকস্মাৎ কি যে হ'ল, নতমুখে হাতব্যাগ খুলি'
পশ্চাতে ফেলিলে ছুঁড়ে ভিক্ষাপাত্রে একটি আধুলি।

প্রেম : হাজার বছর আগে

গুপ্ত মণিকুট্টিম পেরিয়ে
রত্নবেদী।
সেখানে সুষুপ্তিলীনা কুলকুণ্ডলিনী
মহামোহে তমোনিমগন।
ওগো নৈরামণি,
তনুতন্ত্রী স্বৈরিণীকে বেঁধে নিয়ে যাও
মুক্তদল শীর্ষ-সহস্রারে।

আমি মহাসুখবাদী সহজসাধক।
পঞ্চস্কন্ধ-বিরহিত
শূন্যতার বুকে
রতিরসে সুরভিত তোমার মিলন
নিঃশ্রেয়স উপাস্য আমার।

কমলের মর্মকোষ
বিদ্ধ হোক্
নিষ্ঠুর কুলিশে।
এসো
মোরা পান করি সংজ্ঞাহীন নির্বাণের মধু

কাল রাতে

রন্ধ্রহীন অন্ধকারে
মাঝদরিয়ার বুকে হাল-ভাঙা নাবিক দেখো নি ?
তাহলে আমার দিকে চাও ।
কাল রাতে আমি সেই মৃত্যুভীত নাবিক ছিলাম ।

আকাশে ছিল না তারা,
সমুদ্রের বুকে ছিল ঝড়,
উত্তাল ঢেউয়ের মুখে তরীখানি ছিল অসহায় ।
বিনাশের বিভীষিকা হিংস্র শ্বাপদ হয়ে
আমাকে কবলে পুরেছিল,
বুকে ছিল দিশাহারা দুরুদুরু মৃত্যুর ইশারা ।
প্রেতায়িত চেতনায় একটি মুমূর্ষু শিখা
আলেয়ার মতো ছিল জেগে—
কখন তলিয়ে যাব নিঃসীম অতলে,
কখন আসবে নেমে শেষ সর্বনাশ !

রন্ধ্রহীন অন্ধকারে
মাঝদরিয়ার বুকে হাল-ভাঙা নাবিক দেখো নি ?
তাহলে আমার দিকে চাও ।
কাল রাতে আমি সেই মৃত্যুভীত নাবিক ছিলাম ।

অভিশপ্ত

নিমতলায়
রবীন্দ্রনাথের কোলে তোমাকে শুইয়ে দিয়েছিলুম।
লক্‌লক্‌ আগুনের শিখায়
তোমার মুখখানি আর দেখতে পেলুম না।

গঙ্গাজলের সাথে চোখের জল মিশে
শ্মশানের মাটি শীতল হল।

মহালয়ার তর্পণ শেষ করে গৃহীরা ফিরেছে ঘরে।
পিতৃপুরুষের আশীর্বাদ পেয়েছে তারা।
আমি অভিশপ্ত পিতা
ঘরে ফিরেছি।
সেখানে আর কোনদিন তোমাকে দেখতে পাব না।

একটি হরিণশিশু

আমার চেতনারণ্যে
একটি হরিণশিশু
রাতদিন ঘোরাফেরা করে।
চোখে তার ছলছল বিষণ্ণ করুণা
কানে তার উচ্চকিত স্পর্শভীরু হাওয়া
চঞ্চল চরণে তার দ্রুততাল নিত্যপলায়নী।

আমার চেতনারণ্যে
একটি হরিণশিশু
রাতদিন ঘোরাফেরা করে।
দিনের প্রহর কাটে শ্যামল কোমল তৃণদলে,
রাতের প্রহর তাকে কোলে নিয়ে বিবশ বিভোর।
মায়াবিনী মায়াপাশে অনুক্ষণ আমাকে ভুলায়,—
দিন কাটে রাত কাটে তারি মোহে তারি ছলনায়।

সেই নদী

'বলাকা'র নদীটিকে তোমরা দেখেছ।—
অদৃশ্য নিঃশব্দ তার জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।
ভৈরবী সে, বৈরাগিণী—
মহাকাল-সহচরী
সৃষ্টি-মন্দাকিনী।

আরো এক নদী আছে—
বাংলার বুকের দুলালী।
নদীয়ার ঘরে ঘরে
খেলা করে।
নাচে গায়,
পিপাসা মেটায়।

সেই নদী শিশু হয়ে হাসে
আমার মায়ের কোলে।
সেই নদী প্রাণপ্রবাহিণী ;
সেই শিশু প্রেমের রাগিণী।

একদিন তুমি বলেছিলে

একদিন তুমি বলেছিলে,
আলোটা নেবাও।

তারপর
কত দিন কত রাত পার হয়ে গেল।
তারাভরা দুটি চোখ থেকে
কত আলো
অশ্রুজলে হল রামধনু।

কখনো বর্ষার ঝড়ে নিবে গেছে আকাশপ্রদীপ,
শীতের কুয়াশা এসে
নতুন ভোরের আলো ম্লান করে গেছে।

আজ প্রৌঢ় বেদনায়
হাসিকান্না মহাশূন্যে ভাসে।
আলো নেবে
অন্ধকারও নেবে।

শুধু দুটি তারাভরা চোখে
আরো এক জীবনের আলো
শান্তরশ্মি মণিদীপে জলে।

উত্তীর্ণ গোধূলি

কুয়াশার শাদা পশমে মুখ ঢেকেছে শীতের সন্ধ্যা,
দূরের পথ দৃষ্টিসীমার বাইরে।
উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষার তমিস্রাভেদী আলো জ্বালিয়ে
পথ চেয়ে আছি—
কখন অন্ধকার নড়ে উঠবে,
ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসবে একটি ক্লান্ত করুণ মূর্তি,
আসবে তুমি।

কবি বলেছেন :
'আমার গোধূলি-লগন এলো বুঝি কাছে
গোধূলি-লগন রে,
বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে ওঠে
সোনার গগন রে!'—
আমাদের গোধূলি-লগ্ন
বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে ওঠে না।
সারাদিনের প্রাণান্ত পরিশ্রমে
সারাদেহের রক্ত উঠে আসে মুখে—
ওরি নাম সূর্যাস্ত।

আকাশে শুক্লা-সপ্তমীর শশিকলা,
তারার চুমকি-দেওয়া ইস্পাত-নীল ওড়নায়
মুখের আধখানা ঢাকা।
মর্ত্যলোকে সহস্র দীপ অন্ধকারসমুদ্রে ভাসমান
এই তো তোমার ঘরে ফেরার লগ্ন।

হায় রে বিংশ-শতাব্দীর স্বল্পবিত্ত মহানাগরিক !
একলা পুরুষের উপার্জনে
জমাখরচের হিসেব আজ তিনশূন্যে বেসামাল।
তাই অসূর্যম্পশ্য অন্তঃপুর থেকে সরীসৃপ পথে
নারীকে বেরিয়ে আসতে হয়
জীবিকার অন্বেষণে,
চলতে হয়
মেহনতি জনতার ভিড়ে।

আজকের মতো আমার দিনগত পাপক্ষয়
শেষ হয়েছে,
তোমার হয় নি।
তাই ঘরে ফিরে এসে তাকিয়ে আছি পথের দিকে—
কখন অন্ধকার নড়ে উঠবে,
ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসবে একটি ক্লান্ত করুণ মূর্তি,
আসবে তুমি।

একদিন তোমার মধ্যে চেয়েছি নারীকে,
আজ তোমাকেই চাই।
আমার জীবনযুদ্ধের অংশভাগিনী,
আমার প্রাণের দোসর।

সেই অন্ধকারে

তুমিই নেবাও আলো,
তুমিই জ্বালাও।

রাত শেষ হয়ে গেলে
তবু রাত
রাতের আঁধারে লেগে থাকে।

বধির তিমিরে
প্রভাত-পাখির গান
ডুবে যায়।

দিশাহীন পথের দুপাশে
জেগে থাকে
মরণের অতন্দ্র প্রহর।

নিরীশ্বর সেই অন্ধকারে
সব আলো নিবে গেলে
আবার তোমাতে ফিরে আসি।

একটি আলোর পাখি

একটি আলোর পাখি এসেছিল ফুলের বাগানে।
কণ্ঠে তার সুধা ছিল,
সারাদেহে রামধনু রং।
পাতার আড়াল থেকে
হাসি আর কান্না নিয়ে
ছিল তার চুনি-পান্না খেলা।
সে খেলায় আমাকে সে ডাক দিত
আলো আর গান আর ফুলের জগতে।

আমার ঘরের পাশে শ্যামস্নিগ্ধ সবজির ক্ষেত,
শস্যময় ফসলের মাঠ,
মৃত্তিকার পাত্র ভরে জীবনের সহস্র সঞ্চয়।
ওরি মাঝে
আলোর পাখির কণ্ঠ ছড়াতো অমিয়,
সব-কিছু হতো মধুময়।

সে-আলোর পাখি আজ ডেকে ডেকে চুপ করে গেছে
রামধনু রং থেকে ঝরে না গানের সুধা আর।
আমার ভুবন তাই শূন্য মনে হয়—
মূল্যহীন মনে হয় শ্যামস্নিগ্ধ সবজির ক্ষেত,
শস্যময় ফসলের মাঠ।

আমি শুধু খুঁজে ফিরি
একটি আলোর পাখি ফুলের বাগানে।
কণ্ঠে যার সুধা ঝরে,
সারাদেহে রামধনু রং।

রক্তগোলাপ

আজ সারাদিন আমার চেতনার মালঞ্চে
ফুটে আছে একটি রক্তগোলাপ,
তার সুরভির ঝরনাধারায়
সুধাস্নান করে উঠলাম আমি।
জানি একদিন এ-ফুল শুকিয়ে পড়বে ঝরে,
বিবর্ণ হবে তার পাপড়িগুলি,
গন্ধ যাবে শূন্যে মিলিয়ে,
রক্তগোলাপ হয়ে যাবে একমুঠো ধুলো।

তবু আজ আমার মনের আকাশে
নতুন সূর্য উঠেছে রক্তগোলাপ হয়ে,
আমার মর্মকোষে তারি সুরঝংকৃত অরুণাভা।
তারপর একদিন
সূর্যাস্তের রঙে রাঙা হবে বিদায়-দিগন্ত,
রক্তগোলাপের বিলীয়মান বেদনা
ছড়িয়ে পড়বে আকাশ জুড়ে।
আমার হৃদয়ের উৎসমুখে
আসন্ন হবে শেষমোক্ষণের পরম লগ্ন।
ঝরে পড়বে অনিঃশেষ ঝরনায় রক্তগোলাপ,
আমার অন্তিম বেদনা লীন হয়ে যাবে তারি সুরভিতে।

প্রাচীন কবির চোখে

একটি মিষ্টি পাখি
ভোরের সানাই হয়ে
রাতকে জাগায়।

আকাশের রঙ্গমঞ্চে শুরু হয়
উষা আর অরুণের বৈদিক নাটক

পৃথিবীর প্রেক্ষাগারে বসে
প্রাচীন কবির চোখে
আমি দেখি প্রত্যহের ছবি।

নিশান্তের নীল মায়া
আরক্ত নয়ন মেলে
দিগন্তে বিলীন।

হঠাৎ নিশুতি রাতে

সাঁঝের ষোড়শী ছিল
মেঘে ঢাকা।

হঠাৎ নিশুতি রাতে
চোখ মেলে দেখি
নিঃশব্দ প্লাবনে ভাসে আকাশ-ভুবন

গাঢ় ঘুমে পৃথিবী ঘুমায়।

জ্যোৎস্নার পিপাসা নিয়ে
একটি তরুণ সর্প
মন্ত্রমুগ্ধ ফণা ঊর্ধ্বে তুলে
শিল্পিত পাথর।

নির্বাণ

আমি তো তোমারি চোখে শেষবার মৃত্যুকে দেখেছি

তখন আকাশ
পৃথিবীর নগ্নবুকে তমোঘন আলিঙ্গনে বাঁধা।

আলোকের মুমূর্ষু নিঃশ্বাস
তারাগুলি
প্রত্যাসন্ন নির্বাণে নিমীল।

আকাশে আদুল গায়ে

মজ্জায় কাঁপন-লাগা হিমে
আকাশে আদুল গায়ে
একা জাগে পৌষের রাত।

চাঁদ যদি সূর্য হত…
মাঝে মাঝে মনে হয় তার ঃ

মৃত্যুর পাওনা নিয়ে
মর্ত্য থেকে ফিরে যাবে
নরকের দূত।

ততদিন যদি দিন থাকে
ফাল্গুন ফুটাবে ফুল
রোমাঞ্চিত রাতের তিমিরে।

মাটির পিদিম ও মহাকাশ

আরো এক আলোর ভিতরে
　　আরো এক জীবনের প্রেমে
ওরা এই পৃথিবীর সীমা
　　ক্রমাগত পার হয়ে চলে।

নিরালোক মরণের আঁধি
　　আমাকে কেবলি ঘিরে থাকে
আমি তাই মাটির পিদিমে
　　জীবনের আলো খুঁজে ফিরি।

ওরা যায় চাঁদের আকাশে
　　চাঁদের মাটিকে ওরা ছোঁয়
তুমি যদি আমার আকাশ
　　আরেক আকাশে কেন যাই।

যং লব্ধ্বা…

একদিন ঈশ্বরকে ভালোবেসে বলেছিলুম,
সবাইকে হারাতে পারি
তোমাকে পারব না।
তুমিই আমার সব—
আমার জীবনের জীবন।

তারপর একদিন পেলুম তোমাকে।
বুঝলুম
ঈশ্বরকে হারাতে পারি
তোমাকে পারব না।
তুমিই আমার সব
আমার ঈশ্বরের ঈশ্বর।

রাধা

প্রেমের বাঁশিতে
তোমার নামটি সাধা,
সেই নামে প্রেমময় ডাকেন তোমাকে :
নামসমেতং কৃতসংকেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্

সৃষ্টিবৃন্দাবনে
শ্যামবর্ণা যমুনার রহঃকেলি-কলিত হিল্লোল।
নীপবন শিহরিত হরিতে হিরণে।

এই লীলানিকেতনে
হ্লাদিনী-প্রতিমা তুমি
হরিণীবিহীন চাঁদ কনকলতায়।

তোমার প্রেমের লোভে
মানুষের রূপ ধরে আনন্দস্বরূপ।
তোমার চোখের আলো দুই চোখে মেখে
আত্মদীপ আপনাকে চেনে।
অপূর্ব আস্বাদময়ী আরতি তোমার,—
তারি প্রার্থনায়
শংকিত-সংকেত-কুঞ্জে
অনন্ত-প্রতীক্ষা-রত
বিমুগ্ধ মাধব
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্।

সমুদ্রের তীরে বসে বসে

সমুদ্রের তীরে বসে বসে
একটি অবুঝ মন
অকারণে হয়েছিল খুশি।
দেখেছিল
নীল জল সোনা হয় সকালে বিকেলে,
চাঁদের কিরণ ছুঁয়ে
ঢেউগুলি হাসে খিল্‌খিল্‌,
বাতাস মাতাল হলে
কি জানি কি যেন হয় তরলে অনিলে।

সমুদ্রের তীরে বসে বসে
একটি অবুঝ মন
অকারণে হয়েছিল খুশি।

তারপর একদিন
একটি পাগল এসে
ডুবে গেল সমুদ্রের বুকে।
ডুবে গেল সে-তলে
যেখানে ঢেউয়ের খেলা নেই,
সূর্য নেই, চন্দ্র নেই,
নেই কোনো মাতাল বাতাস।
ডুবে গেল,
এক হয়ে গেল।

সমুদ্রের তীরে বসে বসে
একটি অবুঝ মন
অকারণে হয়ে গেল কবি।

মায়াদণ্ডে বিকশিত

মায়াদণ্ডে বিকশিত
রজনীগন্ধার গুচ্ছ বুকে নিয়ে
কত রাত হল কোজাগরী।

সূর্যোদয়ে
শুধ্ দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের
ক্ষতচিহ্ন-লাঞ্ছিত চেতনা।

তবু জানি
জীবজীবনের প্রান্তে আরো এক জন্ম আছে-
বহু জন্ম জন্মান্তর পার হয়ে হয়ে
সুরভিত সত্তার গভীরে
ফুল হয়ে ওঠা।

প্রেমকে মৃত্যুকে

কবজি-ঘড়ি চোখে বেঁধে জীবন কাটাই
মহাকাল বুকে বসে আছে
দেহলিতে অরুণ সারথি

তুমি এলে প্রহেলিকা সমস্ত ভুবন
কবজি-ঘড়ি
মহাকাল
অরুণ সারথি

কাজ করি জৈবযন্ত্রণায়
পালাবার পথ খোলা নেই

তুমি এস
তুমি এস
তুমি এস

অপারগণ

নিস্তরঙ্গ দিঘিজলে ঢিল-ছোঁড়া এলোমেলো ঢেউ
ছত্রাকার

নিশীথের সুখসুপ্তি বীতনিদ্র শয়নকণ্টকে
রক্তক্ষরা

অধ্রুব আশ্রয়নীড় ধূর্জটির কুটিল জটায়
উন্মূলিত

এবার নিজেকে খুঁজে দেখ
রহস্যের যবনিকা কাঁপে কিনা তৃতীয় নয়নে

পক্ষিজাতক

নিঃসীম আকাশ থেকে উড়ন্ত ডানার গতি টেনে
সেই পাখি ডুবে যায় অতল আঁধারে।

তারপর সারারাত জন্মের যন্ত্রণা।
জৈবতাপ কোমল পালকে ঘষে ঘষে
আত্মদাহী অগ্নি-উজ্জীবন।

দপ্ করে জ্বলে ওঠে কালের কুলায়—
রক্তিম শিখায় জ্বলে রাত্রির আকাশ।

উজ্জ্বল ধবল দুটি বিশাল ডানায়
নিশান্তের সেই পাখি আবার আকাশে উড়ে যায়

আমাকে তোমার কবি কর

বল্মীকের স্তূপে ঢেকে আমাকে তোমার কবি কর
আমি কণ্ঠে রামনাম নেব।

তমসার প্রসন্ন সলিল
হিংসামত্ত নিষাদের ক্রূর শরাঘাতে
ক্রৌঞ্চমিথুনের রক্তে নিত্যকলুষিত
তবু আমি ভৎর্সনার ভাষা ভুলে যাই।

অভিশপ্ত শতাব্দীর আর্তনাদ
আমাকে তো কাঁদাতে পারে না।
আমিও ওদের দলে
মূঢ় গড্ডলক।

আমাকে প্রোথিত কর
বল্মীকের উর্বর মাটিতে
আমি কণ্ঠে রামনাম নেব।

অহন্যহনি

মৃত্যুকে খাঁচায় পুরে
যত খুশি দানাপানি দাও
ভুলবে না।

মেলা ভেঙে গেলে
ধুলোর তুলোটে
মানুষের পদচিহ্ন
শ্বাপদ-নখরে
হিজিবিজি।

তবু জীবনের মানে
মৃত্যুকে খাঁচায় পুরে রাখা।

আমাকে আমার হাতে

আমাকে আমার হাতে
ছেড়ে দাও।

বারোয়ারি তোতা হয়ে
শিবিরে শিবিরে
প্রভুর শেখানো বুলি
কপ্‌চাতে বোলো না।

বুলবুলিতে ধান খেয়ে গেলে
খাজনা-বন্‌ধ্ আন্দোলনে
ডেকো না আমাকে।

বর্গী এলো দেশে—বলে
আমার শান্তির নীড়
তেজস্ক্রিয় ধূলির কলুষে
ঢেকো না ঢেকো না।

পদ্মদিঘির পাড়ে

পদ্মদিঘির পাড়ে এখন তিনটে কুকুরছানা
জৈবক্ষুধায় সকাল সন্ধে চেঁচায়
পদ্মদিঘির পাড়ে এখন ফেরিওলার হাতে
পরীর শিশু প্ল্যাস্টিকেতে গড়া।

যুগবিজয়ার দিনে

স্বপ্ন আর স্মৃতির শিশির
ঝিনুকের পাখনায় ঢেকে
রেখে যাব।

আমাদের ব্যর্থপ্রত্যাশার
সেই মুক্তা
তোমাদের কালের গলায়
মালা হবে।

তার মাঝে
যদি কিছু অশ্রু আর রক্ত লেগে থাকে
অভিশপ্ত পূর্বপুরুষের

ক্ষমা করো।

নবজন্ম

সিজারিয়ানের পরে মরফিয়ায় আচ্ছন্ন চেতনা।

উঁচুতে উপুড়-করা
স্যালাইন-বোতল।
রাবার-টিউব-লগ্ন রজতসন্নিভ সূচীমুখ
অনুবিদ্ধ দক্ষিণ শিরায়।
ফোঁটা ফোঁটা লবণাম্বু
টিপ্...টিপ্...টিপ্...

দুগ্ধফেননিভশয্যা প্রসূতি-সদন।

তন্দ্রালীন নিমীল নয়নে
শুয়ে আছে অচঞ্চল লাবণ্য-প্রতিমা।
মাতৃত্বের প্রসাধনে শুভ্ররুচি প্রাণপ্রসবিনী।

শ্রাবণ

আমার শ্রাবণ
গলায় অশ্রুর মালা
অসিতাঙ্গী শবর-রমণী ।

জাতিস্মর ।

সিতাসিত দুইপক্ষ চেতনায় অবলুপ্ত করে
আকাশ ভুবন মেঘমল্লারে দোলায় ।

শরৎ

শাদা পালে দিন ভেসে যায়

সবুজ যেখানে নীল
সেখানে আকাশ
পৃথিবীর কোলে এসে শিশু।

প্রতিবেশী গৃহস্থের ঘরে
সোনার প্রতিমা বধূ
দুচোখে কাজল।

খেয়াঘাটে

আকাশে দুর্যোগ ছিল কালবোশেখির।

নদীতে অনেক ছিল জল
বেসামাল ঢেউ দেখে ভয়ে ভয়ে বলেছিলে
পার করে দাও।

সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামা-স্বর শুনি।

সেঁউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
সেঁউতি হইল সোনা দেখিতে দেখিতে।

নায়ের গলুই ছিল কানা
তবু তুমি আনায়াসে পার হয়ে গেলে।

মেঘভাঙা গোধূলি-আলোয়
মাঠের ওপারে গ্রামখানি
হাতছানি দিয়ে দিয়ে ডেকে নিয়ে গেল।

তোমার খুশিতে মূঢ় ভুলে গেল পারানির কড়ি।

রাত্রিকে

রাত্রিকে বলেছিলাম
প্রিয়া হও
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনী।

সে এসে আমার পাশে শুল
রূপসী তমসা।

আকাশ-বাসরে
তারাফুলে ফুলশয্যা গাঁথা।

শাশ্বত স্মরতলীলা
আলোকে আঁধারে।

বন্দিনী

আমাকে কাঁদায় যারা তুমি তো তাদের কেউ নও—
তুমি মায়ামন্ত্রে বন্দী অপরূপ রূপের কারায়।

ফুল তুমি?
ফুলেরা কি কথা বলে চোখের আভাসে?
পাখি তুমি?
পাখিরা কি পদাবলী-কীর্তন শোনায়?
নারী তুমি—সুন্দরী রূপসী?
রূপসী কি বাসনার ভাষা কেড়ে নেয়?

ফুল নও
পাখি নও

নীবিমোক্ষ-বাসনার বিবসনা ইন্দ্রধনু নও।
তুমি চিরপ্রহেলিকা—রূপদক্ষ কবির কল্পনা।

কালের যাত্রার ধ্বনি শুনতে পাইনে আমি আর;
তুমি তার ভুলায়েছ মন।
আমিও পথের কথা ভুলে বসে আছি।
কি-জানি-কি কাজ ছিল যেন
ভুলে গেছি ; সব ভুলে গেছি।

আমাকে কাঁদায় যারা তুমি তো তাদের কেউ নও—
তুমি মায়ামন্ত্রে বন্দী অপরূপ রূপের কারায়।

নিষিদ্ধ চম্পক

কাল সারারাত আমার শোবার ঘরে
ফুলের গন্ধে বাতাস মাতাল ছিল

কাল সারারাত আমার শোবার ঘরে
চুরি-করে-আনা পাঁচটি কাঁটালিচাঁপা··

কাল সারারাত আমার শোবার ঘরে
চোখের পাতায় স্বপ্নেরা নেমেছিল

তুমি যদি

তুমি যদি আরো কিছু বিশ্বাসের মাটি
রেখে যেতে পথের দুপাশে

আরো কিছু ঈশ্বরের বীজ

তাহলে
তাহলে আমি

তপস্বীর স্বেদ-রক্ত ঢেলে

পৃথিবীর এক কোণে
পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে পেতাম।

সর্বহর

যন্ত্রণাও ভুলে যাব।

যেখানে বুকের শিরা ছিন্ন হয়ে তাজা রক্ত ঝরে
সেই গূঢ় ক্ষতমুখে
মহাকাল বিস্মরণী আঙুল বুলাবে।

মহাকাল সর্বহর মৃত্যুর দোসর।

কালের মন্দিরে

কালের মন্দিরে
ঘণ্টা বাজে
শেষ-আরতির ঘণ্টা।

নত হও

শান্ত হও

শুদ্ধ হও

যে বেদনা দিয়েছ
পেয়েছ···
মুক্ত হও।

বুকের বাঁ-ধারে
ঘণ্টা বাজে
শেষ-বিরতির ঘণ্টা॥

লোকায়ত

বঙ্গোপসাগর থেকে
গাঙ্গেয় বদ্বীপে
বীর্যবান আকাশের ধারা নেমে এল।

আকাশ ও বসুধার প্রথম সংগম।
মাটির সোঁদাল গন্ধে বাতাস মাতাল হল যেন।

পরদিন ভোরে
বিজ্ঞ চাষী কৃষ্ণনগরের
আলপথে পা চালিয়ে বলে :
মেয়ের আমার
সবে তো ভেঙেছে লজ্জা !
আরো ক'টি বর্ষণের পরে
হাল চালাবার কাজে তৈরি হবে ফসলের জমি।

একটি গোলাপ

আস্তাকুঁড়ে
বোঁটাছেঁড়া একটি গোলাপ
পড়ে আছে।
পাপড়িতে রক্তের কাজল।

পুষ্পলাবী বিলাসীর গোপন বাগানে
ফুটেছিল।

সূর্যরমা উর্বরা বসুধা
অভিশপ্ত যুবতীর নিষিদ্ধ আঁতুড়ে
রুদ্ধশ্বাস জন্ম বুকে নিয়ে
আজো হায় বড়ো অসহায়!

প্ল্যাটফর্মে

ঝাল-মুড়ি বিক্রি করতো চলমান ট্রেনে
তরুণ কিশোর।
বাপ নেই,
মায়ের একটি ছেলে,
দুটি ছোট বোন,
যৎসামান্য ওরি আয়ে চলে যেত অচল সংসারই।

বর্ধমানেই বাড়ি,
বর্ধমান জংশনের প্ল্যাটফর্ম ঢালুতে গড়িয়ে
যেখানে ছুঁয়েছে মাটি
সেখানেই শুয়ে আছে জীবনের খাজনা চুকিয়ে।

বেপাত্তা মুড়ির টিন,
মশলার কৌটোগুলো ছত্রখান ছিটকে পড়েছে।

শেষ ঠোঙা ঝাল-মুড়ি খদ্দেরের হাতে তুলে দিতে
বিদ্যুৎ-ঝড়ের কথা সে কি ভুলে গেল?
অথবা পাওনা তার বুঝে নিতে ক্ষণমাত্র হল বেসামাল?
কিংবা কেউ…
কী যে হোল সে-ই শুধু জানে।
অথবা জানারো আগে,
কোনো-কিছু বোঝার আগেই
শাণিত-বিদ্যুৎ-চক্র লোহার দানব
মাথা আর হাত দুটো তার
কেটে নিয়ে গেল।

বিপরীতগামী ট্রেনে প্ল্যাটফর্ম পার হতে হতে
বারোয়ারি দর্শকের ভিড়ে
কসাইখানার ছবি আচম্‌কা ভেসে গেল চোখে,
ছবি নয়, আমারি মনের মরীচিকা,
হয়তো বা দুর্বলের মৃত্যু-বিভীষিকা !

মহাশক্তি
পরমকরুণাময়ী
বিশ্বের জননী !
জীবন মরণ
স্তন হতে স্তনান্তরে তাঁরি নাকি লুকোচুরি খেলা !

তাই দেখ তরুণ কিশোর
মায়ের কোলের পাশে
আশৈশব যেমন শুয়েছে
অবিকল সেইভাবে পা-দুখানা আদরে গুটিয়ে
শেষবার নিশ্চিন্ত আরামে
শুয়ে আছে আধখানা হয়ে।

শিল্পী

একরাশ শুকনো খড় দড়ি দিয়ে বেঁধে
পরিশুদ্ধ গঙ্গামৃত্তিকায়
মৃৎশিল্পী প্রতিমা বানায়।
নগ্নকান্তি নারীমূর্তি ধরা দেয় প্রথম প্রহরে,
দ্বিতীয় প্রহরে
সপ্তবর্ণ-আভরণে জন্ম নেয় ধ্যানের দেবতা।

তারপর
মানসপ্রতিমা তার সামাজিক পূজার মণ্ডপে
ভক্তজন তুলে নিয়ে যায়।

মাটির কুটিরে বসে শিল্পী ততক্ষণ
নতুন প্রতিমা গড়ে মনের মতন।

রূপকল্পময়ী

দিনের প্রহরগুলি অকৃতজ্ঞ বন্ধুদের মতো
দূরে পলাতক।

একটি নাছোড় শিশু
শুরু থেকে ঘাড়ে চেপে আছে।
মূঢ় বলে,
ধরে দাও সোনার হরিণ।

ঘরে-আনা গোধূলির লাস্যময়ী সন্ধ্যাটির তারা
বাঁকা ঠোঁটে হাসে মিটিমিটি।

তোমাকে বৃথাই খুঁজি দিনান্তের পথিকনিবাসে—
মেঘের কাজল চোখে রাত্রি আসে বিশ্বাসঘাতিনী

কবিতাকে

পাথর-বসানো সোনা খুলেই ফেলেছ,
রঙিন শাড়ি ও জামা প'র না এখন,
প্রসাধনে নেই আর মাদক সুরভি।

বাণীও বক্রোক্তিস্তব্ধ,
অনুরক্তি প্রতীকী ভাষণে ?

তবু তুমি
শুধু তুমি
প্রতীক্ষা আমার

সুতনু কবিতা।

নেপথ্যনায়িকা

প্রাণান্ত প্রহারে
বিদ্রোহীকে মাটিতে লুটিয়ে দিয়ে
সম্মোহিত মায়াদণ্ডে আবার বাঁচাও।
তারপর
তৃষ্ণাশুষ্ক কণ্ঠে তার বুকের পীযূষ দাও ঢেলে।

কালের ঘরণী তুমি
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের নেপথ্যনায়িকা।

ভঙ্গুর মাটির ঘরে মেতে আছ অদৃশ্য খেলায়,
নশ্বর পুতুলগুলি তোমার নির্মম হাতে কাঁপে অসহায়

শৃঙ্খল

উত্তরস্থরির ব্রতে উত্তরাস্য হ'য়ে
আসনে নিষণ্ণ হও বিদ্রোহী সন্তান।

গোত্রপিতা অন্তরীক্ষে সতৃষ্ণনয়ন
চেয়ে আছে ;
কালের তাণ্ডবে কাঁপে ধারারক্ষী ঘৃতদীপশিখা।

হে পুত্র, শৃঙ্খল ছিঁড়ে মুক্তাঙ্গনে পালাবে কোথায় !
অমল জন্মের ঋণ পরিশোধ ক'রে দিতে হবে
শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তর্পণের পাত্র পূর্ণ করে।

মহালয়া

আমার মায়ের নামে
দু'ফোঁটা চোখের জল নিয়ে
তুমি এলে।

সম্মুখে শারদ ষষ্ঠী
তবু আজ দুই চোখে মৃত্যুর প্রতিমা।

কালসিন্ধুতীরে
পারানি হারিয়ে বসে আছি।

এপারের হাহাকার ওপারে কি কিছু শোনা যায়?

চল্লিশ বৎসর

যৌবন চেনে না তাকে।

যে-রথের সারথি সে
তার চাকা ছোঁয় না এ মাটি।
কখনো সে অনায়াসে পার হয় স্বপ্ন-তেপান্তর,
কখনো তাসের দেশে সকল-নিয়ম-ভাঙা বিদেশী প্রেমিক

আলো আঁধারের ছাঁদে
মাটি দিয়ে, আলো দিয়ে
তিলে তিলে মহাকাল গড়ে তোলে যে-মর্ত্যপ্রতিমা
সুখে দুঃখে সঙ্গিনী সে জীবনের গৈরিক পথের।

যৌবনের মোহময় সীমানা পেরিয়ে
ভাগ্যবান হলে
কেউ কেউ তার দেখা পায়।

চাঁদে-পাওয়া রাতে

পূর্ণিমার রাত
সেদিনো সুন্দর হবে দিব্যপ্রসাধনে।
ঘরন্তী মায়ের কোলে
চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যাবে।
জ্যোৎস্নামত্ত তরুণ-তরুণী
উন্মুক্ত মাঠের বুকে ভুলে যাবে সমাজ সংসার।

কৌমুদীজাগর সেই চাঁদে-পাওয়া রাতে
আমি নেই
আমি শুধু নেই।

তার চেয়ে

প্রেমকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দাও।

বালুকা-বিস্তার মরুভূমে
প্রাণান্তক পিপাসায় পরিক্লান্ত চলেছে পথিক
তৃষ্ণার পানীয় তার
দিগন্তের মরীচিকা
রঙিন ছলনা।

তার চেয়ে
হে সুন্দরী
প্রেমকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দাও।

তমস্বিনী

রাতের আকাশ তুমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাও।

পেথিড্রিনে
চেতনা অবশ হলে
হৃৎপিণ্ড সাপ্‌টে ধর কঠিন মুঠিতে।

আলো আর আলেয়ায়
জীবনের দিনগুলি
চোখের পলকে চলে যায়।

দেহলিতে সাঙ্গ হল চোর-চোর খেলা—
এবার পড়েছে ধরা
চিরপলাতক।

আমি তোমার জন্যেই

আমি তোমার জন্যেই বেঁচে থাকব।

সূর্য যখন সাতটি ঘোড়ার রাশ টেনে নেয়
সেই স্বর্ণগোধূলিতে
চিত্রপটের মতো শব্দহীন বিশাল আকাশ
আমার পুকুরের স্নিগ্ধ জলে অবগাহনে নামে

সেই প্রশান্ত পরিস্নাত বিশ্বভুবনে
আমার নিস্তরঙ্গ চেতনায়
হে সুন্দর,
আমি তোমার জন্যেই বেঁচে থাকতে চাই।

শেষের পাতায়

প্রাণের দোসর ছিল বুকের কুলায়ে।
সে আজ প্রহরগোনা বোমা,
কখন বিদীর্ণ হবে
জানা নেই।

ফসল-কাটার মাঠে নিঃস্ব খড় কুড়িয়ে কুড়িয়ে
ভুলের মাশুল শুধু বেড়েই চলেছে।

দিগন্তে শীতের সন্ধ্যা দ্রুত নেমে আসে।

যাকে যা দেবার নয়
তাই দিয়ে দিয়ে
ফুরিয়েছে বিশ্বাসের পুঁজি।

জমা-খরচের খাতা
হিজিবিজি কাটাকুটি খেলা।

শেষের পাতায়
কিছু ঋণ শোধ করা বাকি।
তাই নিয়ে
ভগ্নজানু একটি বিষাদ
নিষ্করুণ তোমার দুয়ারে
ফিরে ফিরে আসে, আর
দুরুদুরু বুকে ফিরে যায়।

নির্বাণ

কালো রাত
আরো কালো করে
চলে যাব।

আলোর পুতুল নিয়ে
কি হবে তখন

তার চেয়ে স্মরণের বাতিটি নেবাও—
কালো রাত
আরো কালো হোক।

অদৃশ্য হাওয়ায়

অদৃশ্য হাওয়ায় শুনি
কার কণ্ঠস্বর :
আমি আছি।

অন্ধকারে পথ চলি
সেই শব্দ সঙ্গে সঙ্গে চলে।

ওঠে ঝড়,
সিংহের গর্জনে কাঁপে রাত,
হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ হয় শাণিত বিদ্যুতে

মৃত্যুরূপা অমর্ত্য প্রতিমা
শ্মশানে শবের বুকে নাচে।

ওরি মাঝে
অদৃশ্য হাওয়ায় বাজে
সেই কণ্ঠস্বর :
আমি আছি।
আমি আছি।
আমি আছি।

অধিশাস্তা

অরসিক এক বৃদ্ধ
শ্যেনচক্ষু গোয়েন্দার মত
জেগে আছে অতন্দ্র প্রহরী।

স্বয়ংচালিত লিফটে
বহুতল মর্মরপ্রাসাদে
মোজেইক মণিকুট্টিমের কোলে
হীরকখচিত রত্নবেদী।
স্বর্ণসিংহাসনে
নবকুবেরের লক্ষ্মী অচঞ্চলা।

নাট্যমঞ্চে
স্তরে স্তরে খসে পড়ে সভ্যতার সুচারু নির্মোক।

প্রেক্ষাগারে
বিত্তেশকুলের
পরকীয়া বাসনাসঙ্গিনী
চক্রবাক্-মিথুনের চঞ্চু দুটি ছুঁয়ে আছে শিথিল কাঁচুলি।
সিন্থেটিক স্বচ্ছতায়
অনাবৃত
কস্তুরীচর্চিত নাভিমূল।

রজনীর মধ্যযামে
নিয়নের মধুচন্দ্রিকায়
শুরু হবে মদনের মহোৎসব-লীলা।

অরসিক সেই বৃদ্ধ
কামনার মোক্ষধামে
বৃথা জাগে অতন্দ্র প্রহরী।

হংসদূত

ভাগীরথীতীর থেকে ব্রহ্মপুত্রনদের কিনারে
দুধের সাগর
সাঁতরে পেরিয়ে এল
বোইং সোয়ান।

একালের হংসদূত
দূরকে নিকট করে
পরকে আপন।

শতাব্দীর কবিসত্তা তুমি।
তোমার মানসহংস
মিলনের বিশ্বদূত,
পাখায় প্রেমের হাওয়া নিয়ে
উড়েছে আকাশপথে
দেশে দেশে
কালে কালে
মানুষে মানুষে।

সেই দুটি পাখি

প্রাচীন ঋষির
সেই দুটি পাখি
আমার বুকের নীড়ে এসে
কি জানি কেমন যেন বিগড়ে গিয়েছে।

একটি কেবলি বলে :
স্বাদু ফল
শীতল পানীয়ে
আর রুচি নেই।
যদি বা নিষিদ্ধ কিছু থাকে
তাই দাও,
তিক্ততপ্ত পানপাত্রে জীবনের স্বাদ নিতে চাই।

যে শুধু অবাক চোখে
দেখেছিল মানুষের হাসিকান্না জন্মমৃত্যু খেলা,
দেখেছিল
আকাশ পৃথিবী জুড়ে
ছায়া আর আলোকের মিষ্টি লুকোচুরি,
সত্যি আর মিথ্যের ছলনা,—
সে এখন চোখ বুজে আছে।

তার ভাষা নিরাশায় ভরা।
শুধু বলে :
বড়ো বেশি দেখা হয়ে গেছে,
অতো বেশি দেখা ভালো নয়।
এবার আমাকে তুমি অন্ধ করে দাও।

শব্দের পাখিরা

শব্দের পাখিরা
খাঁচার ভিতর থেকে কেবলি আকাশে উড়ে যায়

তার পরে
উড়ে উড়ে ক্লান্ত হলে
বুকের খাঁচায়
অসহায় ফিরে ফিরে আসে।
শিস দেয়, গান গায়, শেখানো বুলিও কিছু বলে।

মনে করি
এবার ওদের যদি পাওয়া গেল হাতের নাগালে
শেখাবো এমন ভাষা এখনো যা ভাষার অতীত।

হায়,
পলাতক শব্দের পাখিরা
আমাকে অবাক্ করে আবার আকাশে উড়ে যায়

ভুবনডাঙার পথ

ভুবনডাঙার মাটি
যে-সন্ধিতে ছুঁয়ে আছে
শান্তিনিকেতন,
সেখানেই
বোলপুর স্টেশনের পথে
শ্রীবাসিত
গুটি কয় অপরূপ শিল্পের বিপণি।

হঠাৎ সেদিন দেখি
পথের বাঁ-ধারে
তেরপলের ছাউনির নিচে
ঝুলে আছে
মানুষের অন্নময় কোষের রসদ।

হাতের নাগালে
খুঁটি-বাঁধা
গোটা ছয় নির্বোধ ছাগল
অসহায় চেয়ে আছে অত্যাসন্ন নিয়তির দিকে।

আমরা নির্বোধ নই,
তাই চেয়ে দেখি
শিল্পে আর স্বাদু মাংসে
ভুবনডাঙার পথ
নির্বিকার চলে গেছে জনপদ পেরিয়ে পেরিয়ে।

পাগল ভাই

কবির রক্তকরবী যে-মানবীর ছবি
একদিন তুমিও তাকে ভালোবেসেছিলে।
কিন্তু কী মনে করে
হারজিতের বাজিখেলা থেকে সরে গেলে!

পাগল ভাই,
তুমি কি সত্যি জেনেছ
কাছের পাওনাকে নিয়ে বাসনার যে দুঃখ
সে দুঃখ কেবল পশুর?
আর দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্ক্ষার যে দুঃখ
তা-ই শুধু মানুষের?

তাই বুঝি মানুষের ওই দুঃখ বুকে নিয়ে
সমুদ্রের অগম পারের দূতীকে
তুমি কেবল হৃদয়-বিদারণ গান শুনিয়ে বেড়াও?

কিন্তু যেদিন
দুখের পারাবারে চোখের জলের জোয়ার লাগে,
সেদিন তোমার দুখজাগানিয়া
সত্যিই কি তোমার ব্যথার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে?

পাগল ভাই,
মকররাজের মহতী বিনষ্টিকে আমি বুঝি,
মৃত্যুর মধ্য দিয়ে রঞ্জনের জয়যাত্রার রহস্যও দুর্জ্ঞেয় নয়
কিন্তু নন্দিনীকে
আমি কিছুতেই বুঝতে পারিনে।

মনে হয় বড়ো নিষ্ঠুর!

যাকে সে ভালোবাসে

তার জন্যে সব সমর্পণ করে বসে আছে।

কিন্তু

যে একদিন তাকে পেতে চেয়েছিল

অথচ পেলো না,

যে সারাজীবন সেই না-পাওয়ার বেদনাই

বুকে বয়ে বেড়াচ্ছে

সেই হতভাগাকে কি তার কিছুই দেবার নেই?

পাগল ভাই,

আমার মনে হয়

এই জগৎটা হারজিতের বাজিখেলা।

সে খেলায় যে পরাজিত

সেই তো সর্বহারা!

জানি একদিন রক্তকরবীর পালা শেষ হবে,

পাতালের সুড়ঙ্গ-খোদাইকরদের কাছে

আসবে মুক্ত আকাশে পৌষের ডাক।

চাঁদের উল্টো পিঠে যে অন্ধকার

সেই অন্ধকারে তোমার করুণ মুখখানি আর দেখতে পাব না।

হঠাৎ

নিজের বুকের দিকে তাকাই—

দেখি অন্ধকারের একপ্রান্ত থেকে

তোমার সকরুণ গান ভেসে আসছে:

'ওগো দুখজাগানিয়া…।'

নৈসর্গিক

একটি বিস্ময়ঘন পৌরাণিক পাখি
রহস্যের নিকেতনে বসে
বাঁশুরিয়া কণ্ঠে যন্ত্র-সংগীত বাজায়।

সুরের পাগল
আকাশ-রসিক যত নক্ষত্রের দল
বিশুদ্ধ শিল্পের প্রেমে শোনে সেই কালোয়াতি গান।

যূথভ্রষ্ট কালের বলাকা
আলোকে ডুবিয়ে পাখা মহাশূন্যে নিঃশব্দে মিলায়।

দেবতার মহিমা হারিয়ে
পূর্ণচন্দ্র
বিশ্বযানী মানুষের অন্তরঙ্গ প্রাণের দোসর।

নিঃসঙ্গ

রয়েছ সবার সাথে,
অথচ নিঃসঙ্গ তুমি
একা।

পৃথিবীর বুকে
সব প্রেম প্রেম নয়।
জীবনের বাঞ্ছিত দোসর
অমানুষ মানুষের ভিড়ে
ক্বচিৎ যদিবা মেলে, স্বপ্নে আর বাস্তবে মেলে না।

রাহুগ্রস্ত

বিকেলের কনে-দেখা আলোর ভিতরে
ঘাসের গালিচা-পাতা ফুলের বাগানে
সুরভিত নির্জনতা
কতদিন
আমাদের ডেকে নিয়ে গেছে।

নীলাম্বরী রাতের আকাশ
তারার দুষ্টুমিভরা মিটিমিটি চোখে
আমাদের নিমগ্ন দেখেছে।

তারপর
কত যুগ পার হয়ে গেল।
রতিপ্রিয় আমাদের সেই পুষ্পবন
অভিজাত নাগরের বহুতল প্রাসাদে ঢেকেছে

একফালি রাতের আকাশ
পৃথিবীর পলাতক শিশুদের লুকোচুরি খেলা
দেখেও দেখে না।

পুষ্পপাত্র

ফুল বলেছিল—

'সুন্দর আমাতে আছে আমি

তোমাতে সে হল ভালবাসা।'

সেই ভালবাসা

সুকুমার পুষ্পপাত্র

নারীর সত্তায়

প্রেমময় সুন্দরের অনিঃশেষ আনন্দভরণ

লাতুর টিলা

'আমি কি হেরিলাম জলের ঘাটে গিয়া,
নাগরী গো,
আমি কি হেরিলাম জলের ঘাটে গিয়া।'

শ্রীভূমির
ধামাইল গীতের সুর
লাস্যময়ী রমণীর প্রিয়দর্শনের ভাষা নিয়ে
সুচারু ললিতছন্দে
ছায়াঘন পল্লীতে মিলালো।

উৎসব-মুখর
করিমগঞ্জ শহরের কলরোল পিছে ফেলে রেখে
আমাদের অ্যামব্যাসাডর
স্পিডোমিটারের দ্রুত গতির সংকেতে
পৌঁছে গেল লাতুর টিলায়।

অতীতের ইতিহাস
সে টিলার শিরোদেশে
বেদনায় মৌনী হয়ে আছে।

স্মৃতির সরণি বেয়ে নেমে এল
আঠারোশ' সাতান্নোর
প্রজ্বলন্ত উত্তর-ভারত।
বিদ্রোহের বহ্নিশিখা
পূর্ব-সীমান্তের বুকে স্ফুলিঙ্গ ছড়ালো।
চট্টগ্রাম কোষাগার নিঃশেষে লুণ্ঠন ক'রে,

বিদ্রোহীর দল
ত্রিপুরার অরণ্য পেরিয়ে
সিলেটের লাতুর টিলায়
তৈরি হল সম্মুখ-সমরে।

কোম্পানির পদাতিক সেনা
জমায়েৎ হয়েছিল ঢালু নদীতটে।
বিদ্রোহীর অব্যর্থ গুলিতে
প্রথমেই সেনাধ্যক্ষ ব্রিটিশ মেজর
হল ধরাশায়ী।
তবু সেই খণ্ডযুদ্ধে
বিদ্রোহীরা হল পরাজিত।

ইতিহাস জানে
পরাজয় পরাজয় নয়।
জয়ে আর পরাজয়ে
মানুষের ইতিবৃত্ত ক্রমিক মুক্তির পথে
ধ্রুবতালে চলেছে এগিয়ে,
তারই সাক্ষী লাতুবক্ষে মালগড় টিলা।

সংগ্রামের স্মরণিকা থেকে
নেমে আসি সমতল শ্যামল মাটিতে।

ফাল্গুনের মুকুলিত আমের শাখায়
বিরহী কোকিল
দোসরকে ডেকে ডেকে সারা।
অদূরে বাংলাদেশ, তারি কোনো প্রচ্ছন্ন শাখায়
শোনা যায় কুহু কুহু কুহু।

পাখির ডানায় ভাসে সীমাহীন উজ্জ্বল আকাশ।
মানুষের ভৌগোলিক রাষ্ট্রের সীমানা
অর্থহীন ওদের মিলনে।

শহরে ফেরার পথে
পলাশের ডালপালা আবীরের রঙে লালে লাল,
তারি তলে কেউ যদি বিছায় শীতলপাটি,
শুরু হবে বৌ-নাচ রূপকথার স্বপ্নের মতন—

'সোহাগ চান্দ্‌বদনী ধনি, ভালো নাচো তো দেখি।
বালা নাচো তো দেখি
বালা নাচো তো দেখি
চান্দ্‌বদনী ধনি, নাচো তো দেখি।'

অবগাহন

একবার

শুধু একবার

যাওয়া যায়

সেই দ্বীপে

পার হয়ে মৃত্যুপণ গহন সাগর

একবার

শুধু একবার

পাওয়া যায়

সেই দ্বীপে

স্নিগ্ধ অবগাহনের নীল সরোবর

যাত্রা

চড়াই উৎরাই পথে

ক্লান্ত তুমি

রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠে বলেছিলে,

'আর তো পারি নে।'

'তীর্থস্নান না সেরেই ফিরে যাবে ঘরে?'—

যাত্রাসঙ্গী শুধালো কাতরে।

শিবের মন্দির থেকে তখনো পুজোর ঘণ্টা বেজেই চলেছে।

বাকি দিনগুলি

সেদিন আকাশ ছিল নীল,
আজ মেঘে ঢাকা।
মহাশূন্যে দু'একটি তারা
জ্বলে আর নেবে।

সেদিন পথের পাশে অজস্র ফুলের হাসি ছিল,
আজ পথে পথ নেই,—
বিবাগী মাঠের কাঁটা পায়ে পায়ে ফোটে।

অ[illegible]নিতে একদিন যে-শিশুটি এসেছিল বুকে
মায়ের আঁচলে তাকে লালন করেছি।
ওসেবু পালিয়ে গেল—কোথায় কে জানে।

জীবনের বাকি দিনগুলি
শুধু তাকে খুঁজে ফেরা
ভিতরে বাহিরে
মাটিতে আকাশে।

স্মৃতির শৈশব

সাতপুরুষের বাস্তু স্নেহময়ী মায়ের মতন
কেবলি পিছনে ডাকে, 'ওরে আয়, ঘরে ফিরে আয়।'

পাড়া-গাঁর অন্ধকারে গাঢ় ঘুমে রাত কেটে গেলে
হরেক পাখির ডাকে ভোর আসে সোনার থালায়।
বৈষ্ণবের আখড়ায় খঞ্জনীতে জাগরণী বাজে,
পুকুরের চারপাড়ে নানাবর্ণ ফুলের সৌরভ।

গোয়ালে শ্যামলী বাঁধা, বাঁটে-মুখ দামাল বাছুর,
হালের বলদগুলি চেয়ে থাকে মুক্তির আশায়;
গাঁয়ের রাখাল আসে, গোচারণে যাবে ধেনুগুলি,—
সবুজ প্রাণের স্বপ্ন দোল খায় ফসলের মাঠে।

প্রসন্ন নদীর বুকে খেয়া-নৌকো করে পারাপার,
বৃক্ষদেবতার নামে হাট বসে সোমে ও শুক্কুরে;
কত লোক, কত পণ্য, পাঁচ গাঁয়ের ক্রেতা ও বিক্রেতা
দর কষাকষি করে, ওরি সাথে করে আত্মীয়তা।

পাঠশালার পালাশেষে ডাক দেয় খেলার সাথীরা—
শৈশবের সেই স্বপ্নে ফিরে যাওয়া যাবে না কখনো।

বিদায় বেলায়

বিদায় বেলায়
আমাকে তোমার হাতে সঁপে দিয়ে যাব।

তুমি জান
আমার এ নিষ্কিঞ্চন মাটির কুটিরে
মিটিমিটি দেউটির ক্ষীণ শিখাটুকু
তুরন্ত ঝড়ের গ্রাস থেকে
প্রাণপণে রেখেছি বাঁচিয়ে।

বারবার এসেছে তুর্যোগ
দশদিক অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়েছে।
ওরি মাঝে
আমার অঞ্জলিপুটে
আলোর কণিকাটুকু
নেবেনি কখনো।

সারাটা ভুবন জোড়া তমোময় এই দিনগুলি
একদিন অবসিত হবে ;
দেখা দেবে আলোকিত বিশ্বস্ত প্রভাত।

সেদিন আমার কথা
মনে রেখো।
মনে রেখো
একদিন তোমাকেও হারাবার দিন এসেছিল—
দিই নি হারাতে।

নীলকণ্ঠ পাখি

লোকে বলে তোমার ভাঁড়ারে মা ভবানী।
তাই
অনুক্ষণ দশদিকে বুভুক্ষিত দু'হাত বাড়াও।

বাপের বাড়িতে যাবে মায়ের দুলালী,
আদরে আব্দারে
ক'টি দিন জিরোবে,
জুড়োবে।

প্রসন্ন সম্মতি নেই।
অগত্যা
একটি শর্ত—
থাকা যাবে মাত্র তিন দিন।

মোছ চোখ
প্রেমিক-পাগল।

আজই ঘরে ফিরে আসবে শিবসীমন্তিনী
এই শুভবার্তা নিয়ে নীলকণ্ঠ উড়েছে আকাশে

হরগৌরী পাখি

হরগৌরী পাখি
বিকেলে বকুলগাছে এসে বসেছিল।
রুপোয় সোনায় মিলে
অপরূপ।

চেয়ে চেয়ে চেয়ে
সূর্য গেল পাটে।

হরগৌরী পাখি
বিকেল
বকুল
শুধু ছায়া, শুধু কালো ছায়া।

'কে যায় মশাই ?'

সব ক্লান্তি মুছে ফেলে নতুন পালঙ্কে শুয়ে আছে।
চারপাশে
রজনীগন্ধার গুচ্ছ সযত্নে সাজানো !
পুষ্পকে স্তবকে মাল্যে
সারা দেহ ফলে ফুলে ঢাকা।

গৃহীরা বেরিয়ে পথে
প্রশ্ন করে—
'কে যায় মশাই ?'

জ্ঞাতি নয়
পরিচিত পরিজনও নয়,
তবু সে মানুষ।
তাই ওরা
ভূমিতলে নত হয়ে কৃতাঞ্জলি প্রণাম জানায়।

জীবনের অন্তিম যাত্রায়
মানুষের কাঁধে কাঁধে চলেছে পথিক।
সংরাগে সংগ্রামে
মহামোহময় লীলা সংসারের
হেলায় পিছনে ফেলে মহানন্দে চলেছে এগিয়ে।
তাই দেখে
মায়াবন্দী মানুষের শাশ্বত জিজ্ঞাসা—
'কে যায় মশাই ?'

নভশ্চর

তুমি তো আকাশে ভেসে যাও,
ওরা থাকে আদিম নিবাসে।
তুমি খোজো আকাশের মাটি,
ওরা দেখে মাটির আকাশ।

পৃথিবীর সীমানা আকাশ,
আকাশের সীমানা তো নেই।
মানুষের সীমা মানুষতা,
সে সীমা কি পেরোবে এবার ?

আঁধারে-আলোকে

পৃথিবীতে সব স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেলে
অলৌকিক আরো এক স্বপ্ন বুঝি থাকে।
মহাকাশ
সে স্বপ্ন দেখার লোভে লোভে
ডুব দেয় নিরবধি নির্জ্জন আঁধারে।

জীবনের সব সত্য মিথ্যা হয়ে গেলে
হিরণ্ময় আরো এক সত্য বুঝি থাকে।
মহাকাল
সে সত্য জানার লোভে লোভে
সৌরলোকে আলোকের সাথি হয়ে ফেরে

ভয়

রাতের আঁধারে তত ভয় নেই
দিনের আলোয় যত ভয়।

হে আদিম মাতামহী, অরণ্যের সর্পিল আঁধারে
আমাকে পুষেছ তুমি। সেদিনের সহযাত্রী যারা,—
অতিকায় বীভৎস ভয়াল, তারা আজ জাদুঘরে
কালের ফসিল। যুগান্তরে যারা এল তারা কেউ
পশুচারী মানুষের অনুগত বিশ্বস্ত সেবক,
কেউ বা অভয়ারণ্যে স্বকীয় স্বভাবে মুক্তকাম।

মানুষ মানুষ হল ঊর্ধ্ববাহু দ্বিপদী চলনে,
আকাশে দুচোখ তুলে দেখে নিল সুবর্ণসন্নিভ
আদি-উৎস বিশ্বজীবনের। নির্জ্ঞান প্রাণের লীলা
সংযত সুন্দর হল আলোকিত প্রজ্ঞার স্পন্দনে।
তবু সেই স্বৈরাচারী আরণ্যক ফিরে ফিরে আসে
চেতনার অন্ধকারে। ছদ্মবেশী শক্তি তার ভয়ংকর।
তাকে দেখে প্রকম্পিত অন্তরের আলোর সারথি।

অস্তগোধূলিতে

সমুদ্রের ঢেউ গুনে গুনে
সতর্ক সাঁতার
তোমার স্বভাব নয়।
আকাশের তারা গুনে গুনে
পথ চলা…

অন্তরে প্রাণের আলো জ্বেলে
অন্ধকারে
দুরন্ত আবেগে তুমি চল।
অনায়াসে পার হয়ে যাও
অনুশাসনের বেড়া
দেশের দশের ;

ঝরেছে অনেক রক্ত
বিদ্রোহীর পথের পাথেয়।

অস্তগোধূলিতে
বিশ্বজুড়ে নামে বিষণ্ণতা।

কিছু কি প্রত্যাশা ছিল
দূরযানী রহস্যের নিরালোক কোনো নিকেতনে ?
মানবিক দুর্বলতা
কোনো এক মানবীর দ্বারে ?

রূপ অপরূপ

ফুল নয়

ফুলের সৌরভ

অপরূপ রূপ হয়ে দোল খায়

হৃদয়ের আকাশে বাতাসে।

নিশান্তের স্বপ্ন দেখে কলাবতী শ্যামলা বসুধা

আলোর প্রপাতে স্নাত স্নিগ্ধ হয় সুনীল আকাশ

শ্যামলের সুনীলের

অমল সংগমে

জন্ম নেয়

রূপের সৌরভ

আর

সৌরভের রূপ।

যৌবনবেদনারসে

প্রথমা

আমার প্রিয়ার তনু অষ্টাদশ বসন্তের দান,
গর্বিত স্রষ্টার চোখে প্রিয়া মোর স্বপ্নিত বিস্ময়,
কৌতূহলী পুরুষের মনোমাঝে মোহস্বপ্নময়
অজ্ঞাত রহস্য নিয়ে লীলালাস্যে সদাস্পন্দমান।

আমার প্রিয়ার তনু পরিস্ফুট পদ্মের মতন,
নবীন ননীর মত বরতনু অতি সুশীতল,
ফুলের মতন তনু— তারো চেয়ে আরো সুকোমল,
আমার প্রিয়ার তনু সুন্দরের কামনার ধন।

বক্ষে তার যৌবনের উদ্বেলিত মাধুরীবিকাশ,
সে নহে স্রষ্টার দান, স্রষ্টা তাই অজানা কৌতুকে
বিস্ময়-বিহ্বল হয়ে চেয়ে থাকে পীনোন্নত বুকে—
দুটি স্তনে স্পন্দনের কী অপূর্ব দোলন-বিলাস!

সে দোলা বিশ্বের বুকে প্রেমময় আনে'প্রাণগতি,
সে দোলা সৃষ্টির বুকে উচ্চকিত জাগায় স্পন্দন,
আঁখির মুকুরে তার হেরি আমি কল্পিত নন্দন ;—
সুন্দরের পদতলে প্রিয়া মোর সৌন্দর্য-প্রণতি।

প্রেমস্বর্গ-যাত্রিকের পুণ্যতীর্থ প্রিয়ার তনিমা,
প্রহেলিকা পুরুষের, কল্পনার ধ্যানের প্রতিমা।

ষোড়শী

যে কভু বাসে নি ভালো, পড়ে নি যে কোনোদিন প্রেমে,
যে কভু প্রেমের লাগি প্রাণমন দেয় নি বিলায়ে,
অথবা প্রিয়ার স্বপ্নে পরিপূর্ণ যায় নি মিলায়ে,
তার তরে মরণের অমাবস্যা আসে ওই নেমে।

চুপে চুপে ভালোবেসে যে কখনো ভুলে নাই ধরা,
ভুলে নাই জনতার কামনার কুশ্রী কোলাহল,
ভুলে নাই ক্ষুধাতুর মুহূর্তের প্রবাহ চঞ্চল,
ভুলে নাই জীবনের লোভনীয় বেসাতি-পশরা ;

অথবা যে ভালোবেসে অনায়াসে চাহে নি মরণ,
তৃপ্তিহীন যৌবনের ভোগপাত্র তুলে দিয়ে মুখে,
অকস্মাৎ অকারণে পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি সুখে
যে কখনো মরণেরে মনে মনে করেনি বরণ ;

তার তরে মৃত্যু সে তো মুক্তি নয়, আত্মার বিনাশ,
জীবন জীবন নয়, মিথ্যাময় বিস্মৃতি-কাহিনী,
কালের প্রবাহ চলে সর্বগ্রাসী নিত্য-প্রবাহিণী
সে কাল-প্রবাহ তার জীবনেরে করে পূর্ণগ্রাস।

যে কভু বাসে নি ভালো, পড়ে নি যে কোনোদিন প্রেমে,
তার তরে মরণের চির-সন্ধ্যা আসে ওই নেমে।

কলেজ-গার্ল

১

রোজ বিকেল বেলা এই জানলাখানির
ঠিক সামনে দিয়ে,
ওই ঘড়ির কাঁটার সওয়া পাঁচটা হলে
এই রাস্তা বেয়ে ধীরে যায় সে চলে।
তুমি চিনবে ওকে
তার করুণ চোখে,
খুব ক্লান্ত বিষণ্ণতা ফুটবে তাতে,
খান তিনেক পুঁথিও আর থাকবে হাতে,
যাবে আপন মনেই তার মেয়েলি বাঁটের
ছাতা বাঁ হাতে নিয়ে ;
রোজ বিকেল বেলা এই জানলাখানির
ঠিক সামনে দিয়ে।

২

সামনে কলেজ-ফেরৎ যায় একটি তরুণী
তার বাসার পানে,
তার বয়স, যেমন হয়— উনিশ-কুড়ি,
তবু ওদের মতন হয়ে যায় নি বুড়ী ;
তাকে দেখলে পরে
মনে খট্‌কা ধরে—
অত অল্প বয়সে মেয়ে পড়ছে বি-এ ?
কেন তোমাকে ঠকাবো বাজে ধাপ্পা দিয়ে !

সে যে আই. এ-তে প্রথম হোলো সে কথা জান না ?
সে ত সবাই জানে ;
রোজ কলেজ-ফেরৎ যায় সেই যে মেয়েটি
তার বাসার পানে।

৩

তার গায়ের রঙের মত অমন দেখো নি
আর, বলতে পারি।
ঠিক মেঘের পরেই যদি রৌদ্র ওঠে
তবে নতুন পাতার রঙ যেমন ফোটে,
ঠিক তাহার মত
সে যে সুশ্রী কত,
বলে বুঝানো যায় না কভু সে-সব কথা,
দেখে সবারই বুকে আসে চঞ্চলতা ;
তার সুডোল মুখটি আর পাতলা গড়ন
বড় চমৎকারই !
তার গায়ের রঙের মত অমন দেখো নি
আর, বলতে পারি।

৪

তার দুইটি চোখের মাঝে তারাভরা আকাশের
রয়েছে ভাষা।
মানে, আকাশ হতেও চোখ অতল আরো,
তার চাউনি দেখেই প্রেমে পড়তে পারো ;
যদি মনের ভুলে
চায় নয়ন তুলে

তবে তোমার দফাটি সারা বুঝতে হবে,
মানে পাগল হতেও আর বাকি না রবে,
যত অন্যমনাই হও, বিরহী প্রেমিক
বুকে বাঁধবে বাসা।
তার দুইটি চোখের মাঝে তারাভরা আকাশের
রয়েছে ভাষা।

৫

ঠিক দুদিন পরেই বাসা বদলে এদিকে
তুমি আসবে চলে ;
আর তাহারো দুদিন পরে ধরা পিছু ;
ওহে বাড়িয়ে বলি নি আমি তেমন কিছু,—
ছেলে তোমার মত
দেখে এলাম কত !
শেষে নাম ও ঠিকানা সব যোগাড় হলে
প্রেম-পত্র গোপনে কত লেখাও চলে,
এর একটি কথাও আমি বানিয়ে বলি নি,
বলো লাভ কি বলে !
ঠিক দুদিন পরেই বাসা বদলে এদিকে
তুমি আসবে চলে।

৬

সেই মেয়েটি বিকেলে যায় আমার ঘরের
ঠিক সামনে দিয়ে ;
খুব ক্লান্ত তখন তার মুখটি দেখায়,
আজ ক্লান্ত যেমন আমি কবিতা লেখায়,

—আজ কলেজ ছুটি,
থাক্, এবার উঠি ;—
প্রেমে পড়তে আমার বাধা ছিল না কিছু,
শুধু তোমরা সকলে তার ধরলে পিছু ;
শেষে আমার ভাগে যে এক কণাও পড়ে না
দেখি বাঁটতে গিয়ে।
আজ কলেজ ছুটি আর দাঁড়িয়ে কি লাভ,
সে তো যাবে না এখন আর সামনে দিয়ে।

বৌদির ছোট বোন

১

বৌদির ছোট বোন, তার সাথে প্রেম করা চলবে ;
ষোড়শী-সপ্তদশী, ভর্তি হয়েছে সবে কলেজে ;
প্রথম প্রেমের ভাষা স্বপ্নের মত করে বলবে,—
কিশোরীর মত ভীরু, ছেলেমানুষিও খুব চলে যে।
বৌদির ছোট বোন মোর দিবা-স্বপ্নের সবিতা,
ভাব-ব্যঞ্জনাময়ী, মঞ্জু-ছন্দোময়ী কবিতা ;
কুমারী অনাঘ্রাতা, বিশ্বের সুন্দরী শ্রেষ্ঠা,
নবনী-কোমল তনু, মুখের লাবণি অনবদ্য,
নব-যৌবন-বনে সে আমার মৌ-বন-প্রেষ্ঠা,
স্বপ্ন-সাগর মথি লক্ষ্মী এলেন যেন সদ্য !

২

বৌদির ছোট বোন আজিও অনাদৃতা কাব্যে,
শালিকা ও পরকীয়া সেখানে জুড়িয়া আছে রাজ্য,
কবিরা দেয় নি ঠাঁই রসময় দৃশ্যে কি শ্রাব্যে,
তবুও সে রসময়ী, করে নি সে অনাদর গ্রাহ্য।
রূপে পুলকিত তনু, মহীয়সী লীলায়িত লাস্যে ;
কখনো করুণাময়ী, কখনো কৃপণা ঔদাস্যে,
মৌন মধুর হাসি, হাসিতে ঝরিছে সদা অর্থ ;
সে হাসি কখনো টানে, কখনো ঠেলিয়া ফেলে সুদূরে।
সে যেন কাব্য এক, প্রতিটি শ্লোকের হয় দ্ব্যর্থ,
কভু প্রাঞ্জল কভু দুর্বোধ ছলনাই শুধু রে !

৩

বৌদির ছোট বোন আলাপ চালায় ভাব-বাচ্যে,
অল্পই কথা বলে, না-বলে-যা আভাসে তা পূর্ণ ;

চারিদিকে লোকজন, [এদিকেই সকলে তাকাচ্ছে !]

শঙ্কা হৃদয়ে জাগে কখন স্বপন হয় চূর্ণ !

প্রাণের কথাটি তাই বলিতে মরিতে হয় সরমে ;

কেবল না-বলা বাণী জানা আছে মরমে ও মরমে।

আঁখির মুখর চাওয়া, নববধূ-সম কভু লজ্জা,

কখনো ব্যগ্র ভাব, কখনো অল্পেতেই ক্ষুব্ধ ;

কভু অগোছালো বেশ, কখনো বর্ম-সম সজ্জা ;

পরশে শিহর কভু, কভু সে স্বপনে করে লুব্ধ।

৪

বৌদির ছোট বোন, নামহীন মধু সম্বন্ধ,

নহে নিকটের বধূ, নহে সুদূরের অভিসারিণী ;

সে যেন বাতাসে-ভাসা হাস্নুহানার মৃদু গন্ধ ;

ধরা-ছোঁয়া যায় না কো, অথচ সুরভি মনোহারিণী !

কখনো কাজের ছলে দেখা দিয়ে যায় দূরে সরিয়া,

কখনো ছলনা ক'রে বিনা ডোরে কাছে রাখে ধরিয়া ;

আশে-পাশে আছে তবু ধরা নাহি যায় কভু বক্ষে,

কখনো চিনিতে পারি, কখনো পারি না তারে চিনতে,

নেপথ্যে আনাগোনা, যোগাযোগ লঘু প্রীতি-সখ্যে ;

মগ্নচেতন-লোকে ফুটে আছে সুকুমার বৃন্তে।

৫

বৌদির ছোট বোন, তার সাথে প্রেম করা চল্‌তো,

স্বপ্ন সফল হতো, প্রিয়া হতো,—ছিল সম্ভাবনা,

'হতো যা হয় না কেন !'—দাবি আর আছে বাহুবল তো ;

তবে আর কেন তারে একান্ত বধূ করে পাব না ?

স্বপ্ন ও শিহরণ, আশা আর দুরাশার দ্বন্দ্বে

নিবেদন করিলাম সব কথা প্রণয়-প্রবন্ধে ;

ছিঁড়িল স্বপ্ন-জাল, হেরিনু চক্ষু দুটি রগড়ে,

প্রকাশ্য দিবালোকে জ্যোৎস্না মোটেই শোভা পায় না ;

কহিল লজ্জানতা,—'নিবেদিতা হয়ে আছি অগ্রে···

···আপনাকে ভালো লাগে,···ভালবাসা দুজনকে যায় না'।

ক্ষণ-শাশ্বতী

জ্যোৎস্না-ধারায় বিশ্ব ডুবেছে, আলোক-প্লাবিত শরৎ-রাত,
সুনীল গগনে পাণ্ডুচন্দ্র মদির নেশায় তন্দ্রাতুর ;
সাধ যায় সখি, তুমি এসে মোর চুপি চুপি হাতে মিলাবে হাত
প্রথম-মিলন-রভস-আবেশে আমরা শুনিব রাতের সুর !

পুষ্পবীথীতে স্বপন নেমেছে আকাশ হতে,
সন্ধ্যামালতী বিকাশের সুখে শিহরি ওঠে,
মল্লিকা-বন পুলকি উঠিল সফল-ব্রতে,
গন্ধগরবী রজনীগন্ধা নিভৃতে ফোটে।

কুজ্ঝটিকার অবগুণ্ঠনে ইন্দ্রজালের মোহিনী হাসে,
তারকার মালা নভো-নীলিমায় পুষ্পশয়ন রচনা করে,
স্বপনবিলাসী প্রেমিক-প্রাণের কত না বাসনা আকাশে ভাসে !
সে বাসনা সখি, জ্যোৎস্নার সাথে শেষ হবে নাকি রাত্রি পরে ?

পূর্ণিমা রাতে তোমারো প্রাণের প্রেমবিহঙ্গ মেলেছে পাখা ?
নিদমহলের অন্ধ অতলে প্লাবন এনেছে চাঁদের আলো ?
চোখে ঘুম নেই ?—নয়নে কি যেন রূপালি আলোর আবেশ মাখা !
আঁধার-বিহারী প্রাণ বুঝি আজ আলো-জাগরণ বাসিছে ভালো ?

নিশীথ আকাশ মুখর হয়েছে পূর্ণিমাতে—
মাতাল মলয় হল গীতময় সুরভি-বনে,
কোন্ আনন্দে ধরা অনন্ত-নৃত্যে মাতে—
মুক্তি-পাগল সে নেশা লেগেছে তোমারো মনে ?

দিনের আলোয় জাগে না যে-কথা, আঁধারে যে-কথা ঘুমায়ে রয়,
জ্যোৎস্না-নিশীথে তারি গান শুনি ভুবন-ভুলানো তারার গানে ;
তাহারি গমকে প্রাণের গোপন কামনা হয়েছে ছন্দোময়,
সুদূরবাসিনী, সেই সুর বুঝি পরশ করেছে তোমারো প্রাণে ?

পূর্ণিমা-নিশি প্রেম-দেবতার পূর্ণ-প্রেমের মিলন-সাধ—
আলোছায়াময় আমার জীবনে অক্ষয় হোক জ্যোৎস্না-আলো.
অক্ষয় হোক এই মুহূর্ত যখন প্রেমের নেই প্রমাদ,
অক্ষয় হোক এ-মন আমার যে-মন তোমায় বাসিছে ভালো।

কাল নিশি-ভোরে জ্যোৎস্নার আলো মিলায়ে যাবে,
আকাশ-পরীরা দিনের আলোয় কভু কি জাগে ?
এমন স্বপন মাটির জীবন কা. কি পাবে ?
—অক্ষয় করে রেখে যাব আমি এ অনুরাগে।

কুহেলি-মাখানো স্তিমিত আলোয় এস গো মরণ গোপনচারী.
এই মুহূর্ত শাশ্বত করে নাও তুলে নাও মৃত্যু-পার ;
শাশ্বত হোক পূর্ণ এ প্রেম, শাশ্বত হোক স্বপন তারি,
শাশ্বত হোক প্রেমিক প্রাণের জ্যোৎস্না-আলোর মিলন-হার !

দক্ষিণা

ভিখারীর ভীরুতারে বক্ষোমাঝে ঘিরিয়া ঘিরিয়া
দাক্ষিণ্যের দক্ষিণারে কুড়ায়ে কুড়ায়ে চলি পথে,
স্বপ্নময়ী উড়ে চল শ্লথবল্গ তব মনোরথে—
করুণা-কৃপণা তুমি, নাহি চাও পিছনে ফিরিয়া।

সেদিন গোধূলি-লগ্নে ফুটেছিল আকাশের তারা,
সে-তারার মায়াস্পর্শ তব মনে ফুটাল প্রসূন ;
সহসা কহিলে ধীরে,—'যাবেন না, একটু বসুন',—
সে তব সুরের সুরা পান করি হনু আত্মহারা।

জানি সখি, এও তব ক্ষণিকের খেয়ালের খেলা,
তবু এ তোমারি গড়া বাসনার লীলা-প্রজাপতি ;
রঙের বাহার নিয়ে আকাশেতে ওড়ে মৃদুগতি,
ধরিতে পারি না তবু তারি পিছে কাটে মোর বেলা।

সুগভীর প্রেম নহে, নহে সখি নিবিড় প্রণয়,
কৈশোর-সরসী-নীরে ফোটে রাঙা চিত্ত-শতদল—
তাহাও চাহি না সখি, প্রিয়তমে দিয়ো সে-কমল ;
আমার কামনা শুধু প্রেমের যা লঘু অপচয়।

পূর্ণপাত্রে লোভ নাই, শুধু যাহা উথলিয়া পড়ে
তাহারি মদিরালুব্ধ চিত্ত মোর সুখ-স্বপ্ন গড়ে।

অভিলাষ

কৃষ্ণপক্ষ নিশি সুমধুর নীলিমার স্বপ্ন,
আমারে ঘিরিয়া থাক্ সিল্কের নীল শাড়ি— রাত্রি ;
স্নিগ্ধ সুনীল তার আবরণে রহিব নিমগ্ন—
স্বপ্নের সন্ধানী আমি চির-রাত্রির যাত্রী।

জাগরণ আর নয় দিবসের উজ্জ্বল আলোকে,
তোমার মনের তলে যে নীলিমা মোর মন হরেছে
তাই দিয়ে ঘিরে রাখো মিলনের পুঞ্জিত পুলকে ;
রাত্রি কি প্রেমময়ী ?—তাই সে কি নীলবাস পরেছে ?

আসুক আকাশে মোর নীরন্ধ্র মধু-অমাবস্যা,
আসুক নয়নে মোর অজস্র রজনীর তন্দ্রা,—
তুমি আছ মিশে তায় রূপসী অসূর্যম্পশ্যা—
অন্ধের অন্তরে আলোকের মঞ্জীর-মন্দ্রা।

ঘন-নীল রাত্রিতে হেরি তব নীল শাড়ি চক্ষে,
তুমি এস মিশে তায় তৃষাতুর বিরহীর বক্ষে।

শুভদৃষ্টি

চুপ করে চেয়ে দেখ মুখখানি অপরূপ ;
গুণ্ঠনে ঢাকা ওই—চাঁদ কি ?
জ্যোৎস্নার সুধা দিয়ে গড়িল কে সোনামুখ,
অথবা এ মোহিনীর ফাঁদ কি ?
কলরব করিও না, মর্মের খোল দ্বার,
খুলে দাও হৃদয়ের ঢাক্‌না ;
প্রণয়ের দর্পণে চিনে লও প্রাণ তার,
কণ্ঠের ভাষা মূক থাক্ না !

[illegible]ার খাতা খুলে বসে আছি চুপচাপ,
কালিমুখে উৎসুক লেখনী ;
আশে-পাশে শুনিতেছি শব্দের ভুপদাপ,
ছন্দ নামিবে বুঝি এখনি !
ভারতীরে কহিলাম,—সত্বর ধরা দাও,
সার্থক করি নব সৃষ্টি ।
শুনিনু আকাশ-বাণী,—'মুখরতা ভুলে যাও,
চোখে চোখে হোক শুভদৃষ্টি' ।